সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন ● এপ্রিল-জুন ২০২১

শিক্ষালোক

কোনো গাঁয়ে কোনো ঘর কেউ রবে না নিরক্ষর

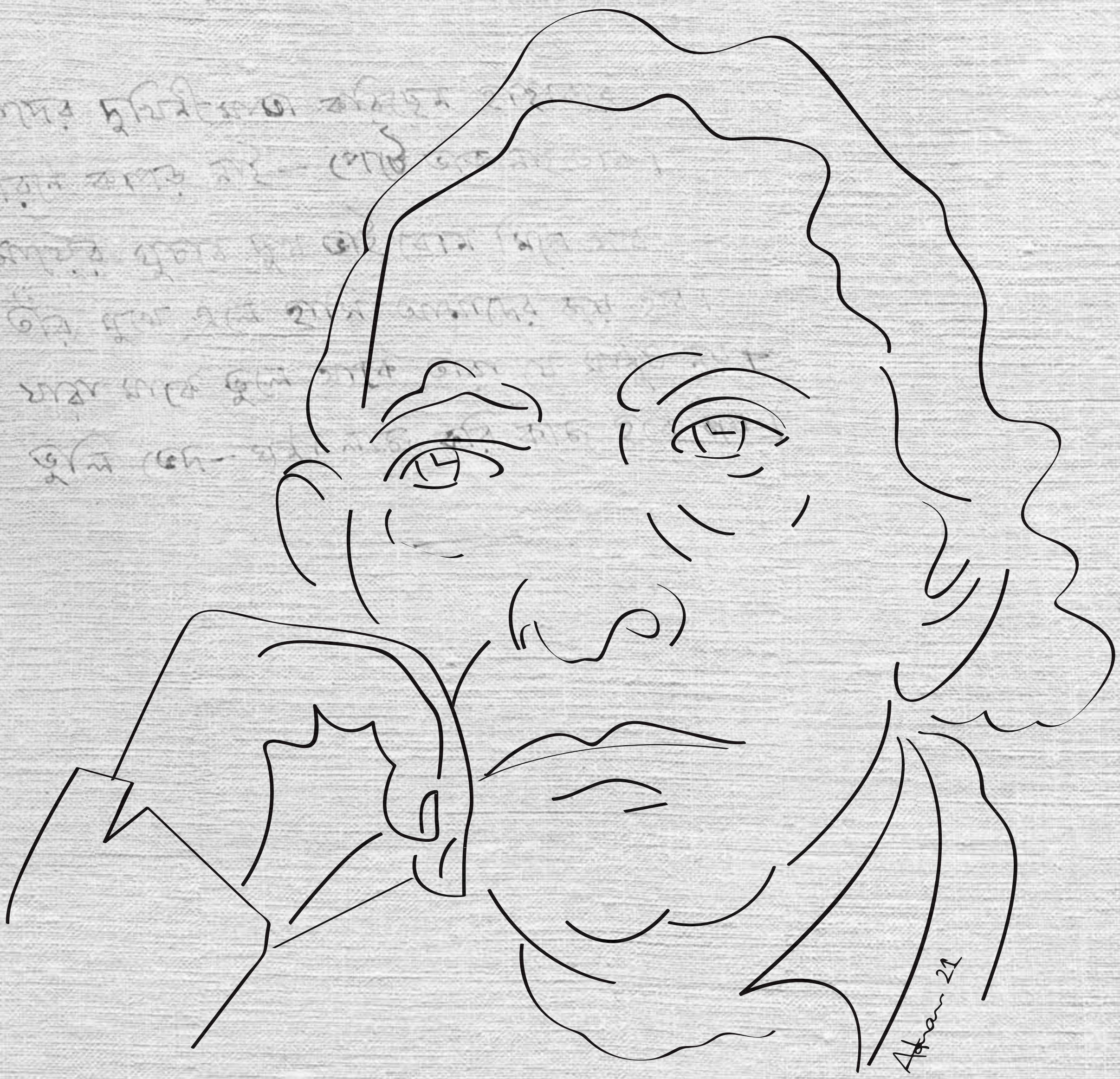

কবি বন্দে আলী মিয়া

বাংলা সাহিত্যে আপন বিশেষ স্থান যার

বঙ্গবন্ধু উচ্চ শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান-২০২১

বক্তব্য রাখছেন মোঃ ফসিউল্লাহ, এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান, এমআরএ। তাঁর বামে সিদীপের নির্বাহী পরিচালক, সিডিএফ-এর নির্বাহী পরিচালক আব্দুল আউয়াল ও সিদীপের ভাইস চেয়ারম্যান শাহজাহান ভূঁইয়া।

বক্তব্য রাখছেন সিদীপের নির্বাহী পরিচালক মিফতা নাঈম হুদা

বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবক

প্রত্যাশী বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয়ের শিশুশিক্ষার্থীদের সঙ্গে এমআরএ-র এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান

সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন
ইমেইল: shikkhalokcdip@gmail.com, ফেসবুক: শিক্ষালোক বুলেটিন

শিক্ষালোক

এপ্রিল-জুন ২০২১ ● ৮ম বর্ষ ২য় সংখ্যা

সূচি

প্রিয় কবি বন্দে আলী মিয়া - শ্যামল দত্ত	২
জাপানের উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা - আলমগীর খান	৬
শিক্ষার উদ্দেশ্য বনাম বাস্তবতা - অলোক আচার্য	৯
ভালই আছেন ঘের অঞ্চলের কৃষক - ফজলুল বারি	১০
কচুরিপানা নিয়ন্ত্রণ ও পানির উপরে মাচায় পেঁয়াজের চারা উত্তোলন - প্রফেসর ড. মো. আমিন উদ্দিন মৃধা	১৩
শ্রীধরকুড়া বিদ্যালয়ে বই উপহার ও বঙ্গবন্ধু বুক কর্নার	১৫
'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ' শীর্ষক রচনা/গল্প/কবিতা প্রতিযোগিতা	১৫
সিদীপে বঙ্গবন্ধু উচ্চ শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান-২০২১	১৬
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্মদিবস পালন	১৭
বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন	১৭
আমাদের শিক্ষা - কাকলী খাতুন	১৮
শিক্ষা বিষয়ক বই নিয়ে রচনা-প্রতিযোগিতা	১৯
মাতৃভাষা শক্তিশালী হবে - মাহবুবুল ইসলাম	২০
ভাষার লড়াই: বাংলায় জ্ঞানচর্চা	২১
আমেনা-মুনসুরের নতুন স্বপ্ন সূর্যমুখীতে	২৩
মিরা রানী এখন সফল উদ্যোক্তা - মো. আতিকুল ইসলাম	২৫
এসএমএপি কৃষি সদস্যের ধান কাটায় সহায়তা	২৬
Review - Afroza Khanam	২৭
শিক্ষা বিষয়ক সাময়িকী শিক্ষালোক - আশরাফ আহমেদ	২৮

প্রধান সম্পাদক
মিফতা নাঈম হুদা

সম্পাদক
ফজলুল বারি

নির্বাহী সম্পাদক
আলমগীর খান

ডিজাইন ও মুদ্রণ
আইআরসি irc.com.bd

সম্পাদকীয়

কোভিড-১৯এর ধাক্কায় আমরা সবাই কমবেশি হিমশিম খাচ্ছি। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে বিরাট ধাক্কা সামলাতে হচ্ছে। ভেবে দেখতে হবে ভবিষ্যতে কী করে এ ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া যায়। এ পরিস্থিতিতে সিদীপ-পরিচালিত শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির কার্যক্রমও বন্ধ আছে। তবে আমাদের আড়াই হাজার উঠান স্কুলের শিক্ষাসুপারভাইজার ও শিক্ষিকাগণ স্বাস্থ্যসচেতনতা সৃষ্টি করে করোনাভাইরাস মোকাবিলায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে গ্রামের শিশু ও তাদের অভিভাবকদেরকে উৎসাহিত করছেন।

এ পরিস্থিতিতেও সিদীপের শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন 'শিক্ষালোক' শিক্ষা বিষয়ক চিন্তাভাবনার চর্চা অব্যাহত রেখেছে। চলতি সংখ্যাটিতে শিক্ষা, প্রান্তিক জনজীবন, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার বাহন হিসেবে বাংলা ভাষার ভূমিকা ইত্যাদি প্রতিফলিত হয়েছে। এ সংখ্যার প্রচ্ছদটি বাংলার মানুষের এক প্রিয় কবি বন্দে আলী মিয়াকে নিয়ে করা হলো। তাঁর জন্ম ১৯০৬ সালের ১৭ জানুয়ারি পাবনার রাধানগর গ্রামে। ১৯৭৯ সালের ২৭ জুন তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর কিছু কবিতা বাংলাদেশের মানুষের মনে গেঁথে আছে ও থাকবে। কবির 'ময়নামতির চর' কাব্যগ্রন্থটি পড়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, "বাংলা সাহিত্যে তুমি আপন বিশেষ স্থানটি অধিকার করতে পেরেছ বলে আমি মনে করি।" এই মহান কবির প্রতি আজ শিক্ষালোকের এই শ্রদ্ধাঞ্জলি।

শিক্ষালোকের অষ্টম বর্ষ চলছে। এ উপলক্ষে এ সংখ্যায় 'শিক্ষা বিষয়ক সাময়িকী শিক্ষালোক: অতীতকে ভিত্তি করে বর্তমানের হাত ধরে ভবিষ্যতে যাত্রার অঙ্গীকার' লেখাটি প্রকাশ করছি। যুক্তরাষ্ট্র-প্রবাসী বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও লেখক আশরাফ আহমেদ গত সাত বছরে প্রকাশিত সকল সংখ্যা নিয়ে এ সুন্দর বিশ্লেষণমূলক লেখাটি দিয়ে আমাদেরকে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন।

কোভিড-১৯ দূর হয়ে আমাদের জীবনযাপন ও সকল কার্যক্রম স্বাভাবিক হয়ে আসুক এই কামনা সবার মত আমাদেরও।

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)
বাসা নং-১৭, রোড নং-১৩, পিসিকালচার হাউজিং সোসাইটি লি:, শেখেরটেক, আদাবর, ঢাকা-১২০৭, ফোন: ৪৮১১৮৬৩৩, ৪৮১১৮৬৩৪।
Email : info@cdipbd.org, web: www.cdipbd.org

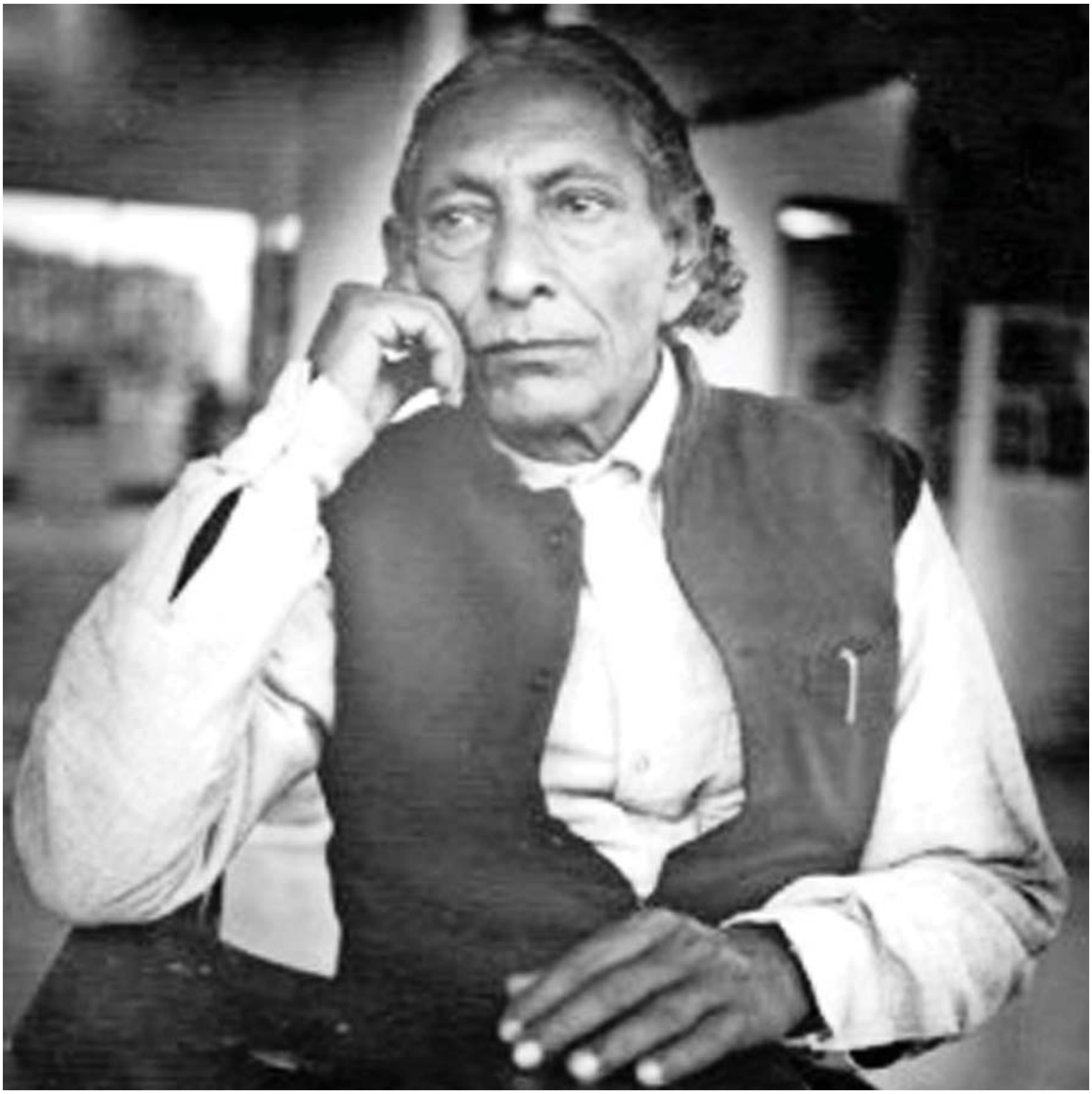

প্রিয় কবি বন্দে আলী মিয়া

শ্যামল দত্ত

'আমাদের ছোট গাঁয়ে ছোট ছোট ঘর,
থাকি সেথা সবে মিলে নাহি কেহ পর।
পাড়ার সকল ছেলে মোরা ভাই ভাই,
একসাথে খেলি আর পাঠশালে যাই।
আমাদের ছোট গ্রাম মায়ের সমান,
আলো দিয়ে, বায়ু দিয়ে বাঁচাইছে প্রাণ।'...
অথবা
'বর্ষার জল সরিয়া গিয়াছে জাগিয়া উঠিছে চর
গাঙ শালিখেরা গর্ত খুঁড়িয়া বাঁধিতেছে সবে ঘর।'...

'আমাদের গ্রাম' কিংবা 'ময়নামতির চর' কবিতাগুলো অনেক আগেই পড়া হয়েছিলো। অবশ্য শখ করে পড়া না হলেও স্কুলের পাঠ্যবইতে এসব কবিতা তখন পড়তে হয়েছে। তখন বলতে আমি স্বাধীনতার পরে আমার স্কুলে পড়া বয়সের কথা বলছি। এসব কবিতা পড়তে-পড়তেই জেনেছিলাম, এসব কবিতার রচয়িতা কবি বন্দে আলী মিয়া পাবনার মানুষ। পাবনাতেই থাকেন। কবিকে সামনাসামনি দেখার খুব ইচ্ছে হচ্ছিলো। কিন্তু কোনো কারণ ছাড়া হঠাৎ করে কি এতো বড়ো একজন কবির সাথে দেখা করা যায়? তাই প্রচণ্ড ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও কবির সাথে দেখা করার মতো কোনো সুযোগ হয়ে উঠছিলো না। অবশ্য কথায় আছে, ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়। সত্যিই সেই উপায় একদিন হলো। অর্থাৎ সুযোগটা এসে গেলো। স্কুলের কজন সহপাঠী মিলে ঠিক করলাম, আমরা একটা পত্রিকা বের করবো। আর সেই পত্রিকার জন্য কবিতা চাইতে যাবো কবির কাছে। উদ্যোগটা ভালোই ছিলো, কিন্তু পত্রিকা বের করার অতো টাকা কোথায় আমাদের! তাই শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হলো, আমরা একটা হাতে লেখা দেওয়াল পত্রিকা বের করবো। এর জন্য তেমন কোনো খরচ নেই। কিন্তু দেওয়াল পত্রিকাটা কোন দেওয়ালে থাকবে, এটা একটা ভাবনার বিষয়। অনেক ভেবে আমরা ঠিক করলাম, পাবনার অন্নদা গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরি দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশের সবচেয়ে ভালো জায়গা। প্রতিদিন এখানে অসংখ্য মানুষ সংবাদপত্র আর বই পড়তে আসে, কাজেই দেওয়াল পত্রিকাটা সবার নজরে পড়বেই।

লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমরা কথা বললাম। কর্তৃপক্ষ রাজি হলেন। তাঁরা আমাদের দেওয়াল পত্রিকার জন্য স্থান নির্বাচিত করে দিলেন লাইব্রেরির বিশাল নোটিশ বোর্ড। লাইব্রেরিতে ঢুকতেই সেই প্রকাণ্ড বোর্ডটিতে সবার নজর পড়ে। সেখানে আমাদের দেওয়াল পত্রিকা থাকলে সবাই দেখতে পাবে, এটাই বড়ো কথা। তাই আমরাও সানন্দে রাজি হলাম। আর ঠিক তখনই মাথায় এলো, দেওয়াল পত্রিকার জন্য কবি বন্দে আলী মিয়ার কাছ থেকে তো একটি শুভেচ্ছাবাণী নেয়া যেতে পারে। কিন্তু অতো বড় কবি কি আমাদের মতো ছোটদের হাতে লেখা দেওয়াল পত্রিকার জন্য শুভেচ্ছাবাণী দেবেন? কিন্তু আর কোনো ভাবনার সুযোগ নেই। কবি তাঁর শুভেচ্ছাবাণী না দিলেও তাঁর সামনে গিয়ে অন্তত দাঁড়ানো তো যাবে। তাঁকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ তো হবে। তাই যেই ভাবনা সেই কাজ। কবির সাথে দেখা করার এই মোক্ষম সুযোগ কিছুতেই হাতছাড়া করা যাবে না।

সালটা ঠিক মনে নেই, কিন্তু তারিখটা মনে আছে। সেদিন তারিখটা ছিল ১০ জুন। বড়দের কাছ থেকে কবির বাড়ির ঠিকানা আগেই জেনে গেছি। তাই পৌঁছে যেতে দেরি হলো না। পাবনা শহরের এক প্রান্তে রাধানগরে কবির বাড়ি। হলুদ রঙের একতলা একটি বাড়ি। বাড়ির নাম 'কবিকুঞ্জ'। দরজায় কড়া ঝাঁকাতে সরাসরি কবি নিজেই এসে দরজা খুলে দিলেন। অতো কাছে কবিকে দেখে কী বলবো তখন ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। কবি তখন নিজেই বললেন, আমার সাথে দেখা করতে এসেছো তো, ভিতরে এসো কথা বলি। ব্যস, আর কোনো ভাবনা নেই। কবি নিজে থেকেই বিষয়টা সহজ করে দিলেন। তারপর দেওয়াল পত্রিকায় শুভেচ্ছাবাণী দিতে হবে শুনে হেসে বললেন, মানী লোকেরা বাণী দেয়। আমি কবি, কবিতা দিতে পারি। একেই বলে বোধহয়, মেঘ না চাইতেই জল। কবি তাঁর লেখার খাতা থেকে একটি পৃষ্ঠা ছিঁড়ে লিখে দিলেন কবিতা। কবিতার নাম 'সাত ভাই চম্পা'। চমৎকার কবিতা:

'সাত ভাই চম্পা জাগো রে!'
'কেন বোন পারুল ডাকো রে?'
'আমি ডাকি ফুল হতে উঠে এসো সব ভাই,
ঘুম ভেঙে উঠে এসো সময় যে আর নাই।
স্বপন দেখিছো বুঝি–ঘুমে তাই অচেতন
ফিরে যায় ডেকে ডেকে রবি কর সারা'খন।

মোদের দুখিনী মাতা করিছেন হাহাকার
পরনে কাপড় নাই–পেটে ভাত নাই তার।
মায়ের ঘুচাব দুখ ভাই বোন মিলে সবে
তাঁর মুখে এলে হাসি আমাদের জয় হবে।
যারা মাকে ভুলে থাকে তারা যে মানুষ নয়–
ভুলি ভেদ-ঘৃণা লাজ করি কাজ হবে জয়।

কবির সাথে কথা বলতে-বলতে তখন সাহস কিছুটা বেড়ে গেছে। তাই বললাম, আপনার কবিতা পেলাম। কোনো দৈনিকের ছোটদের পাতার জন্য কি আপনার একটা সাক্ষাৎকার নিতে পারি? কবি বললেন, অবশ্যই নিতে পারো। আর সেই মুহূর্তেই সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় যে প্রশ্ন মনে এলো, কবিকে প্রশ্ন করলাম। কবিও সাথে সাথে উত্তর দিলেন। শেষে কবি বললেন, সাক্ষাৎকার তো হলো কিন্তু ছবি কোথায়? তাই তো। আমরা তো আর সাথে করে ক্যামেরা নিয়ে যাইনি। আর সে সময় কারও কাছে মোবাইল ফোনও নেই যে ছবি তোলা যাবে। শেষ পর্যন্ত কবির সাথে হাঁটতে-হাঁটতে চলে এলাম শহরের একটি নামকরা ফোটোগ্রাফি স্টুডিও চিত্রায়ন-এ। সেখানেই ছবি তোলা হলো। আর ছবিসহ কবির এই সাক্ষাৎকারটি ছাপা হলো রাজশাহী থেকে প্রকাশিত দৈনিক বার্তা-র ছোটদের পাতা 'শাপলা কুঁড়ির আসর'-এ।

প্রশ্ন: কোন সালে এবং কোথায় আপনার জন্ম?

কবি: ১৯০৬ সালে পাবনার রাধানগরে আমার জন্ম।

প্রশ্ন: আপনি কখন থেকে লিখতে শুরু করেন?

কবি: ছাত্রাবস্থা থেকেই আমার লেখালেখির শুরু হয়। তবে কলকাতা কর্পোরেশনের অধীনে চাকরি করার সময়

> দেওয়াল পত্রিকায় শুভেচ্ছাবাণী দিতে হবে শুনে হেসে বললেন, মানী লোকেরা বাণী দেয়। আমি কবি, কবিতা দিতে পারি। একেই বলে বোধহয়, মেঘ না চাইতেই জল। কবি তাঁর লেখার খাতা থেকে একটি পৃষ্ঠা ছিঁড়ে লিখে দিলেন কবিতা। কবিতার নাম 'সাত ভাই চম্পা'

থেকে আমার লেখা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে।

প্রশ্ন: লেখালেখির জন্য আপনি কার কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পান?

কবি: অনুপ্রেরণার কথা বলছো? একমাত্র গড। মানুষের কাছ থেকে আমি কখনও উৎসাহ বা অনুপ্রেরণা পাইনি। বরং অনেকে আমার লেখার বিরোধিতাও করেছে।

প্রশ্ন: আপনি কাদের জন্য লিখতে বেশি ভালোবাসেন?

কবি: শিশুদের জন্য। যারা সবেমাত্র পৃথিবীতে এসেছে, তাদের যেমন আমি ভালোবাসি তেমনি তাদের জন্য লিখতেও আনন্দ পাই।

প্রশ্ন: আপনার লেখা গল্প এবং কবিতার সংখ্যা কতো?

কবি: অজস্র। সংখ্যা বলা খুব মুশকিল।

প্রশ্ন: সর্বপ্রথম কোন পত্রিকায় আপনার লেখা প্রকাশিত হয়?

কবি: খুলনার একটি পত্রিকায় আমার লেখা ছোট্ট কবিতা প্রথম ছাপা হয়েছিলো।

প্রশ্ন: আপনার বইয়ের সংখ্যা কতো?

কবি: অ-নে-ক। সম্প্রতি আমার লেখা 'চোর জামাই' রি-প্রিন্ট হচ্ছে।

প্রশ্ন: আপনার লেখা কবিতা সম্পর্কে বিখ্যাত কোনো কবি কখনও কি মন্তব্য করেছেন?

কবি: হ্যাঁ, সে সময় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমার 'ময়নামতির চর' কাব্যগ্রন্থ পড়ে আমাকে প্রশংসাপত্র পাঠিয়েছিলেন। তিনি এই কাব্যগ্রন্থটিকে উত্তর বাংলার প্রথম শ্রেণির একটি গ্রন্থ বলেও মন্তব্য করেছিলেন।

প্রশ্ন: আপনি কি কেবল শিশুদের জন্যই লেখেন?

কবি: আমার লেখা দশ-বারোখানা উপন্যাসও আছে। তাছাড়া নাটক-গানও লিখেছি। তোমরা শুনে হয়তো অবাক হবে, একসময় আমি কলকাতা আর্ট স্কুলেও পড়েছি। তাই অল্প-স্বল্প আঁকতেও জানি।

প্রশ্ন: আর্ট স্কুলে আপনার পরিচিত এমন কেউ কি ছিলেন, যিনি এখন অনেক বড় শিল্পী?

কবি: হ্যাঁ, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন আমার সহপাঠী ছিলেন।

প্রশ্ন: আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে আপনার কেমন সম্পর্ক ছিল?

কবি: কবি নজরুল মানে আমাদের কাজীদা। তাঁর সঙ্গে আমি অনেক দিন কাটিয়েছি। তাঁর সহজ-সরল ব্যবহারের কথা কোনো দিন ভুলবো না। তাঁর ওপর কেউ কখনও রাগ করে থাকতে পারতো না। কথায়-কথায় কবিতা আর গান রচনা করা ছিল তাঁর অনন্য সাধারণ গুণ। কিছুদিন আগেও তাঁর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমাকে দেখে কাজীদা চিনতে পারলেন না। শুধু একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। আমার 'জীবনশিল্পী নজরুল' বইটা পড়ে দেখো। ঐ বইতে তাঁর সম্পর্কে আমার অনেক কথা লেখা আছে।

প্রশ্ন: লেখালেখি ছাড়া আপনি এখন কী করছেন?

কবি: এখন রাজশাহী বেতারে চাকরি করছি।

প্রশ্নের ঝুলি আমার শেষ হয়ে গেছে। তাই বাধ্য হয়ে বললাম, আপনাকে অনেকক্ষণ ধরে বিরক্ত করলাম। কিছু মনে করবেন না। আমার কথা শুনে কবি হেসে বললেন, বিরক্ত নই। খু-উ-ব খুশি হয়েছি। তাছাড়া এই অল্প সময়ের পরিচয়ে তোমার যে মিষ্টি কথা আর কোমল অন্তরের পরিচয় পেলাম, তা আমার চিরকাল মনে থাকবে।

এরপর কবির সাথে যোগাযোগটা প্রায় নিয়মিতই হতো। কবি রাজশাহী বেতারে চাকরি করতেন। রাজশাহী থেকে নিয়মিত চিঠি লিখতেন। পাবনায় এলে দেখা হতো। ধীরে ধীরে কবি বন্দে আলী মিয়া যেন আমার বন্ধু হয়ে গেলেন। রাজশাহীর কাজীহাটে কবির বাসাতেও গেছি। কবি কথায়-কথায় কবিতা রচনা করতেন। একবার এক চায়ের দোকানে বসে কবি বললেন, চায়ের সাথে বিস্কুট খাও। আমি বিস্কুট নিতে ইতস্তত করছি দেখে কবি হেসে ছড়ার ছন্দে বললেন:

'কেউ যদি দিতে চায় চা
কখনও বোলো না তাকে না
চায়ের সাথে তুমি চেয়ে নিও টা।'

আমি বললাম, এই 'টা' মানেই কি বিস্কুট? কবি মুচকি হাসলেন। একবার সাহস করে কবিকে প্রশ্ন করেছিলাম,

শ্রদ্ধেয় কবি বন্দে আলী মিয়া'র সাক্ষাৎকার নিচ্ছে শ্যামল কুমার দত্ত

আচ্ছা কবিরা লম্বা চুল কেন রাখেন? প্রশ্ন করার পরই মনে হয়েছিল এ ধরনের প্রশ্ন করা উচিত হয়নি। কিন্তু কবি প্রশ্নের ঠিকই উত্তর দিলেন। বললেন, অন্যরা কেন লম্বা চুল রাখেন বলতে পারবো না তবে আমি কেন রেখেছি সেটা বলতে পারি। এরপর কবি খুব মজা করে বললেন, এই চুলে এখন পাক ধরেছে। কিন্তু একসময় তো এমন ছিলো না। এই চুলে কাজী নজরুলের স্নেহস্পর্শ আছে। তাই কী করে সেই স্নেহস্পর্শ ছেঁটে ফেলি বলো।

কবি বন্দে আলী মিয়ার উল্লেখযোগ্য শিশুতোষ গ্রন্থ: চোর জামাই (১৯২৭), মেঘকুমারী (১৯৩২), মৃগপরী (১৯৩৭), বোকা জামাই (১৯৩৭), কামাল আতাতুর্ক (১৯৪০), ডাইনী বউ (১৯৫৯), কুঁচবরণ কন্যা (১৯৬০), ছোটদের নজরুল (১৯৬০), রূপকথা (১৯৬০), শিয়াল পণ্ডিতের পাঠশালা (১৯৬৩), বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা ও সাতরাজ্যের গল্প (১৯৭৭)। কাব্যগ্রন্থ: ময়নামতির চর (১৯৩২), অনুরাগ (১৯৩২), পদ্মানদীর চর (১৯৫৩), মধুমতীর চর (১৯৫৩), ধরিত্রী (১৯৭৫)। উপন্যাস: অরণ্য, গোধুলি, ঝড়ের সংকেত, বসন্ত জাগ্রত দ্বারে (১৯৩১), শেষলগ্ন (১৯৪১), অরণ্য গোধুলি (১৯৪৯), নীড়ভ্রষ্ট (১৯৫৮), জীবনের দিনগুলো। প্রবন্ধ সংকলন: জীবনশিল্পী নজরুল। শিশু সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ কবি বন্দে আলী মিয়া ১৯৬২ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার এবং ১৯78 সালে রাজশাহীর উত্তরা সাহিত্য মজলিস পুরস্কার লাভ করেন। ১৯88 সালে তাঁকে মরণোত্তর একুশে পদকে ভূষিত করা হয়।

১৯৭৯ সালের ১৭ জুন রাজশাহীর কাজীহাটের বাসভবনে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে কবি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পরে পাবনার রাধানগরের 'কবিকুঞ্জ'তে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

লেখক: গল্পকার ও তথ্যচিত্র নির্মাতা

প্রকৃতির আহ্বান

সালেহা বেগম

প্রকৃতি ফিস ফিস করে বলছে যেন আজ
বিরামহীন নৃশংসতা চালিয়েছো
এ তোমাদের কেমন কাজ
সয়েছি অনেক; ভেবেছি তোমাদের ভুল
ভাঙ্গবেই ভাঙ্গবে
নিরাশ হয়েছি বার বার।
হায় মানুষ!

আর কতো কাল চলবে তোমাদের ধ্বংসলীলা!
তোমরা কি ধরেই নিয়েছ
এ বিশ্ব শুধু তোমাদের জন্য সৃষ্টি!
বড়ই ভুল ভেবেছ;
সৃষ্টিকর্তা প্রকৃতি অবারিত করেছেন–
প্রাণের বৈচিত্র্যকে সুসামঞ্জস্যতায় মুখরিত রাখবেন বলে
তোমরা তা বোঝ বলে মনে তো হয় না।

অথচ বড়াই কর নিজেদের সৃষ্টির সেরা জীব বলে?
প্রকৃতি নিজের আনন্দেই তো তোমাদের দিয়েছে
মন উদাস করা মোহনীয় আলো-বাতাস
পহাড়, নদী ও ঝর্ণার অপরূপ সৌন্দর্য;
মন আকুল করা মাটির সোঁদা গন্ধ
ফুল, প্রজাপতি এমনকি গহীন অরণ্য।

তোমরা তোমাদের পাওয়ার আকাঙ্ক্ষার একটু রাশ টানো
প্রয়োজনের চেয়ে বেশি অর্জনে গৌরবের কি আছে?
অন্যদের কাছ থেকে শিক্ষা তো নাও কিছু;
লোভ ও অহংকার তোমাদের পতনকে
ত্বরান্বিত করছে তা
বুঝতে শিখো এইবার।

জাপানের উন্নয়নে শিক্ষার যে ভূমিকা বাংলাদেশেও তা হবে না কেন?

আলমগীর খান

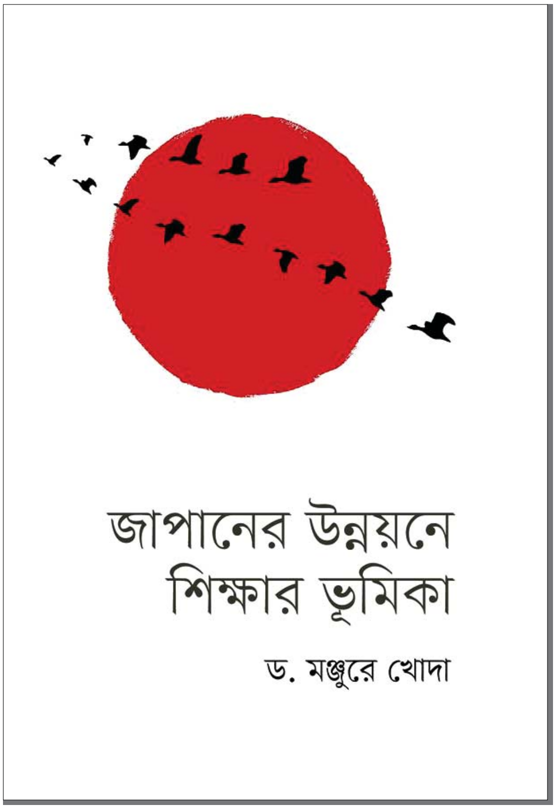

'জাপানের উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা' বইটি ড. মঞ্জুরে খোদার লেখা (দ্যু প্রকাশন, ঢাকা, ২০২০)। কিন্তু এ নামের একটা বই বাংলায় বের করতে হলো কেন? কেন লেখা হলো না–ফ্রান্সের বা কানাডার বা অস্ট্রেলিয়ার বা মালয়েশিয়ার 'উন্নয়নে শিক্ষা' শিরোনাম জাতীয় কোনো বই? 'বাংলাদেশের উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা' ধরনের একটা বই লেখা হলে আমরা দেশবাসী কতই না আনন্দিত হতাম! তা না লিখে জাপানের কথা কেন? লেখক ড. মঞ্জুরে খোদা জাপানে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং তার একাডেমিক গবেষণার বিষয় ছিলো উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ও জাপানের শিক্ষা নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা। অতএব মঞ্জুরে খোদার এমন একটা বই লেখারই কথা। কিন্তু যারা অন্যান্য দেশে গিয়ে গবেষণা করেছেন তারা কী সেইসব দেশের শিক্ষা ও উন্নয়ন অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখতে পারতেন না?

প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে– না, পারা যায়নি। কারণ সত্যি জাপান তেমনই একটি বতিক্রমী দেশ সার্বজনীন মানসম্মত শিক্ষাকে যারা উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে সবচেয়ে সফলভাবে ব্যবহার করেছে এবং শিক্ষা কী যুগান্তকারী পরিবর্তন সৃষ্টি করতে পারে তার অনন্য নজির সৃষ্টি করেছে। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল যেকোনো দেশের জন্য ঐ দেশটি নিশ্চিতভাবেই কেবল অনুসরণীয় নয়, অনুকরণীয়। এই অনুকরণটা যত ভালভাবে করা যাবে ততই লাভ। বাংলাদেশের বিরাট লাভ হতো যদি এই একটি ক্ষেত্রে অন্তত পশ্চিমা বিশেষজ্ঞ, বুদ্ধিদাতা ও কনসালটেন্টদের বিদায় দিয়ে জাপানকে ঠিকমত অনুসরণ, পারলে অনুকরণ করা হতো। তাহলে লেখা হতো কিংবা একদিন হবে অনাগত কাঙ্ক্ষিত সেই বইও– বাংলাদেশের উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা। হবে কি?

মঞ্জুরে খোদা যা বলতে চেয়েছেন তার সারকথা এই। আর তিনি বাড়িয়ে কিছু প্রকাশ করেননি, আমিও করছি না। আশ্চর্য হলো জাপান এই শিক্ষাটি গ্রহণ করেছে পশ্চিমা বিশ্ব থেকে আর তা কাজে লাগিয়েছে পশ্চিমের চেয়েও ভাল করে। অথচ অনুকরণ করতে গিয়ে জাপানিরা তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে একটুও হারায়নি, বরং আরও শক্ত করে আঁকড়ে ধরে রেখেছে, কোনো ছাড় নেই। মানুষের অনুকরণ অর্থ তাই, এমনই হওয়া উচিত। এ ভাবনার বীজ তো বহুদিন আগে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই বপন করে গেছেন তার 'জাপান-পারস্যে' লেখায়: "যে মুহূর্তে জাপানের মস্তিষ্কের মধ্যে স্থান পেল যে, আত্মরক্ষার জন্য য়ুরোপের কাছ থেকে তাকে দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে, সেই মুহূর্তে জাপানের সমস্ত কলেবরের মধ্যে অনুকূল চেষ্টা জাগরিত হয়ে উঠল।" রবীন্দ্রনাথেরই কথায়: "ইতিহাসে এতবড় আশ্চর্য ঘটনা আর কখনো ঘটেনি।" রবীন্দ্র-ভাবনার এ বীজই যেন বৃক্ষ হয়ে জন্মেছে মঞ্জুরের এ বইতে।

জাপান ও বাংলাদেশের মাঝে বহু রকম মিল রয়েছে, আমিলও অনেক–যা নিয়ে এ বইতে চমৎকার আলোচনা আছে। দু দেশের মাঝে এতরকম মিল থাকা সত্ত্বেও আমরা কেন জাপান থেকে এত পিছিয়ে? কত পিছিয়ে? প্রায় দেড়শো বছর–অর্থাৎ দেড়শো বছর আগে জাপানের সমাজ ও রাষ্ট্র শিক্ষার জন্য যা করেছিলো, আমরা তার অনেক কিছুই এখনও করতে পারিনি বা করছি না। তুলনামূলক আলোচনায় লেখক বলেছেন, "১৮৭১ সালে জাপানে সবার জন্য বাধ্যতামূলক একমুখী শিক্ষা চালু করা হয়, এবং ৩০ বছর পর (১৯০৫) বিদ্যালয়গামী শিক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় শতকরা ৯৫.৬ ভাগ।"

এখানে স্মরণীয় যে, তখন ১৮৭১ সালে বাংলাদেশের মানুষ ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ইতিহাসের এক ভয়াবহতম দুর্ভিক্ষের জাঁতাকলে কাতারে কাতারে প্রাণ দিচ্ছে, ভারতব্যাপী ব্রিটিশবিরোধী মহাবিদ্রোহের আগুন তখনও ধিকিধিকি জ্বলছে। এরপরে জাপান যখন একটি সাম্রাজ্যবাদী দেশ হয়ে পরদেশ আক্রমণে তৎপর, বাংলা তখন নিজ স্বাধীনতার জন্য লড়ছে। সাতচল্লিশ পর্যন্ত তার ভাইয়ে ভাইয়ে দাঙ্গা আর এরপর একাত্তর পর্যন্ত একদেশি ভিনভাষীদের সঙ্গে। অবশ্য তারপরও আমরা অনেক সময় নষ্ট করেছি। ফলে "বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও শিক্ষার কিছু অগ্রগতি হলেও ১৯৯১ সালের পূর্ব পর্যন্ত সর্বজনীন শিক্ষা চালু করা যায়নি। দেশে প্রাথমিক পর্যায়েই কেবল ১০ ধরনের শিক্ষাপদ্ধতি, এবং জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষার তিনটি ধারা চালু আছে।"

তবে কেবল কাগজে কলমেই জাপানের সমান হলে কিছু হবে না, সমান হতে হবে কাজে। আমরা হচ্ছি কথার জাতি, জাপানিরা কাজের। লেখক বলেছেন, তারা আপনার জন্য যেটুকু করবে বলে কথা দিবে, কাজ করে দিবে তার বেশি। সেখানে সরকারি-বেসরকারি অফিসে বা ব্যাংকে বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যেখানেই হোক না, কর্মীরা প্রকৃত অর্থেই মানুষকে সেবা করে থাকে, আপনার জন্য কিছু করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করে। সবাই কর্মী। আহা, সেখানকার কর্মীরা কত অভাগা! আমাদের দেশে অফিসে সবাই কর্তা, কত ভাগ্যবান। আপনার জন্য যদি কেউ কিছু করেন তো সে আপনার প্রতি তাদের পরম দয়া, আপনার পূর্বজন্মের কোনো ভাল কাজের ফল। আমরা অফিসগুলোতে যাই ছোটবড় সব কর্মকর্তাদের সেবা করতে, সেবা পাওয়ার কথা কল্পনা করতেও সাহস হয় না! দৃশ্যত ব্রিটিশ গেছে, আছে তাদের প্রেতাত্মারা!

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ব্রিটিশের ভাষাটাও আছে বহাল তবিয়তে। আমরাই এখন জোর করে জাপটে ধরে রেখেছি, ছাড়বো না। যদিও আমাদের আছে মাতৃভাষার জন্য রক্তপাতের গৌরবময় দৃষ্টান্ত, পৃথিবীকে আমরা একটা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপহার দিয়েছি, কিন্তু ভুলভাল ইংরেজি ভাষায় কথা বলা ও সেইসঙ্গে বাংলায় ভাল লিখতে ও বলতে না পারাকেই আমরা শিক্ষার সাফল্য ও গর্ব বলে মনে করি। জাপানিরা তাদের মাতৃভাষাকে কতখানি ভালবাসে তা দুনিয়ার কাউকে বলে বেড়ানোর প্রয়োজন মনে করে না, কিন্তু মাতৃভাষা ছাড়া কোনো কাজই করে না। অথচ জাপানি ভাষা সঠিকভাবে শেখা বাংলার চেয়ে কয়েক গুণ কঠিন।

জাপানি ভাষায় অক্ষর শিখতে হয় প্রথমে ১০০৬টি ও পরে আরও ১১৩০টি। আমাদের হ্রস্ব-দীর্ঘ ইকার-উকার, দুই 'ন', তিন 'স' আর কয়েকখান যুক্তাক্ষর নিয়েই তর্ক, কাটাছেঁড়া ও আলোচনার শেষ নেই। তবু লেখকের কথায়, "তারা যেকোনো বিষয়ের জ্ঞানই মাতৃভাষার মাধ্যমে অর্জন করে। প্রাথমিক থেকে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণাও তারা তাদের নিজস্ব ভাষার মাধ্যমেই করে থাকে। ... বিশ্বের যেকোনো ভাষায় প্রকাশিত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ একাডেমিক ও নন-অ্যাকাডেমিক বই-পুস্তক-জার্নাল ও গবেষণাপত্র তাদের ভাষায় তাৎক্ষণিক পাওয়া যায়।"

তাদের প্রাথমিক শিক্ষাটা শুরু হয় প্রাকপ্রাথমিক থেকে, শতভাগ শিশুর জন্য। সে প্রাকপ্রাথমিক আমাদের কয় বছর হলো শুরু করা সাদামাটা প্রাকপ্রাথমিকের মত নয়। প্রত্যেক শিশু বিদ্যালয়ে যায়, কেউ ক্লাস বাদ দেয় না, কেননা বিদ্যালয় হচ্ছে শিশুদের পরম আনন্দের জায়গা। সেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী একত্রে বসে খাবার খায়। ফি বছর একখান করে চূড়ান্ত পরীক্ষার বালাই নেই। স্কুলে কোনো শিশু অকৃতকার্য হয় না, যদি কেউ অকৃতকার্য হয় সে তার শিক্ষক, কেননা দায়িত্ব শিক্ষকের, সাফল্য শিশুর। সেখানকার সমাজে শিক্ষকরা পরম সম্মানিত ও নিবেদিত-প্রাণ। জাপানে সবচেয়ে মেধাবীরাই কেবল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে পারেন। শিক্ষকের বেতন সেখানে যেকোনো সরকারি চাকুরির চেয়ে বেশি।

আমাদের দেশেও একসময় শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদা ছিলো অন্য যেকোনো পেশার চেয়ে বেশি। ব্রিটিশ-পূর্ব বাংলার গ্রামে যেরকম পাঠশালা-মক্তব ছিলো, জাপানেও ছিলো তেমনি। একেকজন শিক্ষকই একেকটা স্কুল চালাতেন। শিক্ষাদান ছিলো তাদের কাছে ধর্মীয় কাজের মত পবিত্র। শিশুরা সেখানে লিখতে, পড়তে ও গুণতে শিখতো, ভালভাবে। উদ্দেশ্য ছিলো দৈনন্দিন কাজ চালিয়ে নিতে পারা। জাপানে সেটাই বিকশিত হয়ে বর্তমান রূপ নিয়েছে। আর আমাদের সেই পাঠশালার শিক্ষাব্যবস্থাটিকে ব্রিটিশ সমূলে উৎপাটন করে দিয়ে গেছে এখনকার আধা বিদেশি বুলি শেখা কেরানি তৈরির শিক্ষা।

জাপান যেখানে প্রাথমিক শিক্ষাকে প্রত্যেকটি মানুষের দোরগোড়ায় নিয়ে গেছে, আমাদের বিদেশি শাসকগণ সেখানে গণবিচ্ছিন্ন একটি তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত গোষ্ঠী তৈরির কাজে নেমেছিলো। এতদিনেও আমরা সেই আধা বিদেশি বুলি শেখা কেরানি তৈরির উচ্চশিক্ষার খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসতে পারিনি। শিক্ষা তাদের জীবনকে পূর্ণাঙ্গ করে গড়ে তোলার জন্য, আধাআধি করে নয়। জাপানে আমাদের মত এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিজ বলে কিছু নেই, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ তাদের শিক্ষারই অন্তর্গত। আমাদের মত তাদের সমাজে 'বাইরের বই' বলে কিছু নেই, ভাল বই মাত্রই তাদের কাছে পাঠ্য ও প্রয়োজনীয়, বাইরের জিনিস নয়।

আমাদের যারা বড়লোক বাবামা, তারা সন্তানকে স্কুলে দিয়ে আসেন ও সেখান থেকে নিয়ে আসেন গাড়িতে করে। স্কুলব্যাগে দামি খাবার দিয়ে দেন তার সহপাঠী প্রতিদিন কী খায় সে চিন্তা না করেই। শিশুদেরকে শেখানো হয় নৃশংস প্রতিযোগিতা ও

অহঙ্কার–বিত্তের ও মেধার। জাপানে কিন্তু প্রত্যেক শিশু পায়ে হেঁটে স্কুলে যায়। প্রায় প্রত্যেক অভিভাবকেরই ব্যক্তিগত গাড়ি আছে, কিন্তু সেটা তারা সন্তানের সহপাঠীকে দেখাতে স্কুলে নিয়ে যায় না। গাড়ি স্কুল থেকে দূরে থাকে। একে অপরকে সহযোগিতা করার শিক্ষাই তাদের প্রাথমিকের মূল শিক্ষা। বইটিতে অনেক উদাহরণ দেওয়া আছে যা পড়লে তাদের মনুষ্যত্ব, ত্যাগ, সততা, অন্যকে সেবার আনন্দ ইত্যাদি দেখে অনেকের চোখে পানি আসবে।

জাপানি সমাজ সৌন্দর্যের পূজারী। শৃঙ্খলা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা তাদের শিশুকালেই শিক্ষার মাধ্যমে রক্তের মাঝে গেঁথে দেয়া হয়। নৈতিকতা শিক্ষা জাপানের শিক্ষার আরেকটি মৌলিক দিক। সে নৈতিক শিক্ষা পুরোপুরি ধর্মনিরপেক্ষ। সে কারণে তাদের সমাজে পারস্পরিক ঘৃণা নেই, আছে প্রত্যেকের মনের মিল। ১৮৯০ সাল থেকে শিশুদের জন্য প্রতি সপ্তাহে ৩ ঘণ্টা করে নৈতিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। তাদের এ নৈতিক শিক্ষা গুটিকয় নীতিবাক্য শেখায় আবদ্ধ নয়। এ শিক্ষা অন্যের মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা, স্বাধীন চিন্তা ও আত্মনির্ভরশীলতা থেকে জীববৈচিত্র্যের প্রতি দায়বদ্ধ হওয়া পর্যন্ত প্রসারিত। দক্ষতা অর্জনের চেয়েও প্রাথমিক পর্যায় থেকে বিনয়-শিষ্টাচার, সৌন্দর্যবোধ ও নৈতিক চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে আত্মিক বিকাশ লাভ জাপানে শিক্ষার মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

এ বইয়ে আলোচনা করা হয়েছে জাপানে শিক্ষার উন্নয়নে মেইজি সরকারের অনন্য ভূমিকা ও কনফুসিয়ান শিক্ষার উল্লেখযোগ্য প্রভাব নিয়ে। জাপান সম্পূর্ণই একটি পুঁজিবাদী দেশ, অন্যদিকে একাত্তরে বাংলাদেশের গায়ে একটু সমাজতন্ত্রের ঘ্রাণ লেগেছিল, যা জোরে নাক টানলে অল্পস্বল্প এখনও পাওয়া যায়। ওই দেশটি যদি তার শিক্ষাব্যবস্থাটিকে এতখানি সামাজিক অধিকারের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে, তাহলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও ব্যবসায়িক দোষটি আজও কাটানো যাচ্ছে না কেন?

জাপান ছাড়াও ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা উন্নত ও অনুসরণীয়। তবে জাপানের বিশেষত্ব হচ্ছে শিক্ষাকেই তারা তাদের উন্নতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। যেহেতু দেশটির প্রাকৃতিক সম্পদ নাই বললেই চলে তারা শিক্ষার মাধ্যমে তাদের প্রত্যেক নাগরিককে সম্পদে পরিণত করার সাধনা করেছে, অর্থাৎ মানবসম্পদ তৈরি করেছে ও এদিক থেকে পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। বাংলাদেশের জন্য জাপান অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক এজন্য যে, এশিয়ার একটি দেশ হিসেবে দু দেশের মাঝে অনেকরকম মিল আছে। দুই শতাব্দী আগে যে মিল আরও বেশি ছিলো, এখনকার যেসব বিরাট অমিল তার বেশিরভাগটাই ইতিহাসের তৈরি, প্রাকৃতিক নয়। জাপানের শিক্ষাব্যবস্থা তাই আমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি শিক্ষণীয়।

ছোট উঠানের স্বপ্ন

দেওয়ান মামুনূর রশিদ

সিদীপের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক
মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার প্রতি নিবেদিত

ছোট উঠানে চাপাচাপি করে
বিছানা পেতে বসে আছেন
৩০-৩৫ জন নারী, সাথে ক'জন শিশু।
একজন নারী গল্প বলে যাচ্ছেন
ড. ইউনূস, স্যার আবেদ
ও মোহাম্মদ ইয়াহিয়া
কীভাবে মানুষের মধ্যে স্বপ্ন জাগালেন
তাঁদের জীবনের গল্প নারীগণ শুনছেন।
এবার একজন পুরুষ গল্প শোনাচ্ছেন
নারী ও শিশুদের জন্য, দরিদ্রদের জন্য,
শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ক্ষমতায়নের জন্য
এনজিও'র উদ্যোক্তাগণ আরো
কী কী করেছেন, কীভাবে করেছেন,
কীভাবে উঠান বৈঠক শুরু হলো
কীভাবে নারীর ক্ষমতায়ন হলো,
কীভাবে মহিলা সমিতি গড়ে উঠলো
এই সব নানা গল্প।
এমন সব গল্প একজন
মধ্যবয়সী লোক বলেই চলেছেন,
বাধাহীনভাবে।
এমন সময় শ্রোতাদের নিস্তব্ধতা
ভেঙ্গে নজু মাঝির বারো বছরের
মেয়ে নয়নতারা বলে উঠলো
স্যার আমি তাঁদের মতো
বড় হতে চাই, আমাকে ক'টা বই দেবেন?
সিদীপের কর্মকর্তা মিনহাজুল আবেদিন
বই দিয়ে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে
উপদেশ দিলেন, স্বপ্নের কথা শোনালেন,
অন্ধকার ভেঙে আলো জ্বালিয়ে দিলেন
মুছে দিলেন হৃদয়ের জড়তাকে
ছোট উঠানে সৃষ্টি হলো
বৃহৎ স্বপ্ন আর সম্ভাবনা!

শিক্ষার উদ্দেশ্য বনাম বাস্তবতা

অলোক আচার্য

ভারতের রাষ্ট্রপতি ও বিখ্যাত পরমাণু বিজ্ঞানী এ.পি.জে আবদুল কালাম শিক্ষা নিয়ে খুবই চমৎকার একটি মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছিলেন, "যতদিন শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু চাকরি পাওয়া হবে, ততদিন সমাজে শুধু চাকর জন্মাবে, মালিক নয়।" যে কথার বাস্তব প্রমাণ আমাদের আজকের সমাজে প্রতিফলিত হচ্ছে। দুঃখের বিষয়, আমাদের আজকের শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল চাকরি পাওয়া। একটা সার্টিফিকেট আর চাকরি, তারপর জীবনে আর কোন দুশ্চিন্তা থাকে না। পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে দেশে রীতিমত যুদ্ধ হয়। সেটা হলো জিপিএ ফাইভ নিয়ে। এটা রীতিমত দেশের অভিভাবকদের কাছে মানসম্মানের ব্যাপার। সন্তান যদি জিপিএ ফাইভ না পায় তাহলে পাড়া মহল্লাশুদ্ধ মানুষ গালমন্দ করতে থাকে। এমনকি নিজের মাবাবার মুখটাও সারাক্ষণ কালো হয়ে থাকে। কয়েক বছর ধরে জিপিএ প্রথা চালু হওয়ার পর থেকেই এ রকম একটা ব্যাপার চোখে পড়ছে। আমাদের সময়ে জিপিএ ছিল না, ছিল ডিভিশন। সেখানে এখনকার মত গ্রেড পয়েন্ট ছিল না, তবে স্টার মার্কস, লেটার মার্কস, বোর্ড স্ট্যান্ড এসব বড় বড় স্থান ছিল। এখন সেসব নেই। যুগের পরিবর্তনের সাথে সবকিছু পরিবর্তন হয়। এটাও না হয় হয়েছে।

তাই বলে রেজাল্ট, সার্টিফিকেট এমনকি মনুষ্যত্ব পর্যন্ত বিক্রি হয়ে যাবে? মনুষ্যত্ব বিক্রি করে দিব্যি চোখ বুজে অনেকে চাকরি করে যাচ্ছে সারাজীবন। কতজন ভুয়া সার্টিফিকেট দিয়ে বছরের পর বছর চাকরি করছে এদেশে কে জানে। আমাদের দেশে মেধার মূল্যায়নে ঘাটতি থেকে যায়। সব সেক্টরে কমবেশি একই অবস্থা বিরাজ করছে। বাঁকা পথে সার্টিফিকেট অর্জন করে যারা মাথা উঁচু করে চলাফেরা করছে, তাদের মনের মধ্যে কি কখনো এই পাপের জন্য একটুও অনুশোচনা হয়? আয়নায় নিজেকে দেখে কি একটু লজ্জাও হয় না? এভাবে দেশের বিভিন্ন সেক্টরে মেধাবীদের সাথে মেধাবীহীনরা প্রবেশ করেছে। আর তাই ভালোর সাথে খারাপ মিশে দেশের বারোটা বাজাচ্ছে। কারণ যারা এভাবে পেছন দিয়ে উচু জায়গায় যাওয়ার স্বপ্ন দেখে তাদের দ্বারা দেশের উন্নয়ন হওয়া সম্ভব না।

যে শিক্ষা মানুষের ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে না তার কোন প্রয়োজন নেই। আজকাল যেন সেই মূল লক্ষ্য কেবল সার্টিফিকেট। সেটা লেখাপড়া করে হোক বা টাকা দিয়ে কিনে হোক কার্যসিদ্ধি হলেই হলো। কোনমতে একটা সার্টিফিকেট পেলেই সব শেষ। তারপর এদিক সেদিক ধরাধরি করে একটা চাকরি বাগিয়ে সমাজে দিব্যি মেধাবী সেজে ঘুরে বেড়ানো যায়।

অনেক বড় বড় লেখক-কবিদের আর্থিক অবস্থা ভাল থাকার পরেও কিন্তু তাদের অভিভাবকরা শুধু বড় চাকরি পাওয়াার উদ্দেশ্যে লেখাপড়া করাননি বরং তাদের ইচ্ছানুযায়ী পড়ার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে আজ সারা বিশ্বে বেশিরভাগ বড় মানুষ নিজের ইচ্ছানুযায়ী পড়ালেখা করে সৃষ্টিশীল কোন কাজে বিখ্যাত হয়েছেন। শুধু চাকরিবাকরি করে টাকা কামাতে চাননি। বরং স্বপ্ন দেখেছেন আরও দশ জনকে চাকরি দেওয়ার। তাই আমাদের অভিভাবকদের বোঝা উচিত যে সন্তানের মেধা যে পথে বিকশিত হবার সুযোগ পায় বা পূর্ণতা লাভ করে সে পথেই তার প্রকৃত মঙ্গল রয়েছে। বাকি পথ কেবল জোরজবরদস্তির। আবার বিজ্ঞান বিভাগে পড়ালেখা করলেও আবিষ্কারক হওয়ার কথা কিন্তু তেমন একটা কেউ বলে না। কারণ ওতে অধ্যবসায় প্রয়োজন, পয়সা আসে না। অবাক বিষয় হলো মাঝে মাঝে পত্রিকায় দেশের আনাচে কানাচে যেসব আশা প্রদানকারী নতুন কিছু আবিষ্কারের খবর চোখে পড়ে, সেসব আবষ্কিারকদের বেশিরভাগই তেমন উচ্চ শিক্ষিত নন। বরং দীর্ঘদিন ঐ বিষয়টি নিয়ে কাজ করতে করতে একান্তই গভীর ইচ্ছা থেকে সে আবিষ্কারটি করে ফেলেছেন। এখানে বিজ্ঞান তার কাছে নেশা বা ভালবাসা।

কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে ফেল করলেই সবকিছু শেষ হয়ে যায় না। বরং অন্য কোন বিষয়ে তার আগ্রহ আছে ধরে নিতে হবে। কোন নির্দিষ্ট পরীক্ষায় ফেল বা কম মার্ক পেলেই জীবনের সবকিছু শেষ হয়ে যায় না। জীবনের সাফল্য-ব্যর্থতা নির্ভর করে মনুষ্যত্ব অর্জনে। আর তাই যারা পরীক্ষায় ফেল করেছে বা আশানুরূপ ফল করতে পারেনি তারা যেন সব শেষ হয়ে গেছে এটা মনে না করে।

দক্ষ জনসম্পদ তৈরি করতে মেধাবী ছাত্রছাত্রীই প্রয়োজন। পাসের হার বৃদ্ধি করে আপাত শিক্ষার প্রসার হলেও মান না বাড়লে স্থায়ী ক্ষতি হবে। শিক্ষার বাণিজ্যিকিকরণ আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ক্ষতিকারক। শিক্ষা যদি কোন ইতিবাচক মানসিকতা গড়ে তুলতে না পারে তাহলে ধরে নিতে হবে সেই শিক্ষা কেবল বিষ ঢেলেছে, অমৃত নয়।

লেখক: সাংবদিক ও কলাম লেখক

ভালই আছেন ঘের অঞ্চলের কৃষক কল্পনা-বিলাস মিস্ত্রি

ফজলুল বারি

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে, সাম্প্রতিক এক হিসাব অনুযায়ী প্রায় এক লক্ষ কৃষক পরিবার 'ঘের' পদ্ধতিতে চাষাবাদ করেন। ৮০র দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে ঐ অঞ্চলের কৃষকগণ এটি স্থানীয়ভাবে প্রচলন শুরু করেন। এদের অধিকাংশই অতি ক্ষুদ্র কৃষক, কমবেশি আধা একর জমির মালিক কিংবা ভূমিহীন বর্গাচাষী। এলাকাটি নিম্নাঞ্চল হওয়ার কারণে এবং সাগর পাড়ে লোনা পানির ধারে কাছে বলে ঋণের জমিতে চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ চাষের সুযোগকে কাজে লাগানোর জন্যই ঘের চাষের উদ্ভব। স্থানীয় কৃষকরা তাদের ছোট্ট চাষের জমিতে মাছ-ধান-সবজি চাষের একটি উপযোগী ব্যবস্থা হিসাবে এই ঘের-এর সৃষ্টি করেন। একটি ঘেরের সাধারণত তিনটি অংশ থাকে। প্লটের চার ধারে নালা কেটে পাশ দিয়ে ৩-৩.৫ ফুট মাটি উঠিয়ে উঁচু রাস্তা বা 'ডাইক' তৈরি করা হয়। ফলে প্লটের একটি বড় অংশ চাষের জমি, তার কিনার দিয়ে নালা বা পুকুর এবং চতুর্দিকের বেষ্টনীতে উঁচু করা জমি। এই হচ্ছে 'ঘের'। সাধারণত বর্ষাকালে জমির ভেতরটা বৃষ্টির পানিতে ভিজে গেলে নালার পানির সঙ্গে মিশে পুকুরের আকার ধারণ করে। সে সময়ে চিংড়ি, রুই, কাতল ইত্যাদি মাছের পোনা ছেড়ে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে রোপা আমন ধান লাগিয়ে দেওয়া হয়। আর ডাইকের উপরে সারা বছর ধরে নানা ধরনের সবজির চাষ করা হয়। বৃষ্টির মৌসুম শেষ হলে জমিটি শুকিয়ে যায় কিন্তু নালা ভর্তি পানিতে মাছ চাষ চলতে থাকে। শুকনো জমিটিতে কেউ কেউ বোরো ধান করেন, আবার কেউ কেউ রবি শস্য উৎপাদন করেন। অতএব, ছোট্ট এক টুকরো জমিকে ঘিরে সমতল-নালা-ডাইক পদ্ধতিতে 'মাছ-শস্য-সবজি' উৎপাদনের জীবিকাই বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষক পরিবারের জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্য।

এমনই একটি এলাকায় গবেষণামূলক একটি কাজে গিয়েছিলাম ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। খুলনা শহর থেকে সড়ক পথে রওয়ানা হয়েছিলাম অতি সকাল সকাল। মৌখালী নামে যে গ্রামটির উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছিলাম তা ছিল খুলনা শহর থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে খুলনা সদর জেলার দাকোপ উপজেলায় পানখালী ইউনিয়নে। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক পরে আমরা উপস্থিত হলাম মংগা পানখালী ফেরিঘাটে। ছোট একটা ফেরি চলাচল করে ঝপঝপিয়া নদীর উপর দিয়ে। তা পার হয়ে প্রায় আধা ঘণ্টার মধ্যেই আমরা

পৌঁছলাম মৌখালী গ্রামে। এখানেই দেখা পেলাম কল্পনা মিস্ত্রি এবং বিকাশ মিস্ত্রির।

গ্রামের পথ দিয়ে ঢোকার পরে বেশ খানিকটা ভিতরে তাদের বাড়ি। পায়ে হাঁটা রাস্তার দু'পাশে সারিসারি গাছ, পাশেই ধানের ক্ষেত, ঘেরের পুকুর আর সবজির বাগানে ভরা। বাংলাদেশে মাটিকে বলা হয় উর্বর, এখানে সোনা ফলে। এ অঞ্চলের দৃশ্য দেখলে বোঝা যায়, কতটা সোনার ফসল ফলে এ দেশে। কোন খালি জমি চোখে পড়ে না। এমন কি রাস্তার দু'পাশে বড় বড় গাছের গোড়ায় হরেক রকমের লতানো গাছ বেয়ে উঠে গেছে। বৃষ্টির মৌসুম শেষ হয়নি বলে

থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে। রাস্তাঘাটও কাদায় ভরে রয়েছে। এরই মধ্যে গিয়ে পৌঁছালাম তাদের বসত বাড়িতে।

এটি বিকাশ মিস্ত্রির ঠিক পৈতৃক সূত্রে পাওয়া বসত বাড়ি নয়। এটি তার বাবার নানির বাড়ি। নানির কোন সন্তান ছিল না। মৃত্যুর আগে তিনি বিকাশের বাবাকেই জমিজমা দিয়ে যান, কিন্তু বিধি বাম। নানির ওয়ারিশগণ সম্পত্তি দাবি করে কোর্টে গেলে বিকাশের বাবা তার স্ত্রী ও ৩ সন্তানসহ ছিটকে পড়েন। পরে বিকাশের বাবা-মা মারা গেলে বিকাশরা ৩ ভাই এ সম্পত্তি ওয়ারিশদের কাছ থেকে ক্রমান্বয়ে কিনে নেয়। এভাবেই বিকাশ মিস্ত্রি এখন ১ বিঘা অর্থাৎ ৫৪ শতক জমির মালিক। এটুকু জমিতেই আশেপাশের এলাকায় সুদৃশ্য ঘের করে চাষ করেন কল্পনা এবং বিকাশ মিস্ত্রি।

'ঘের'-এর সংজ্ঞা মেনে কল্পনা-বিকাশের এই ৫৪ শতক জমিটিরও তিনটি অংশ। প্রথম এবং প্রধান অংশটির পরিমাণ প্রায় ৩৫ শতক যা চাষের জমি। দ্বিতীয় অংশটি হচ্ছে জমির চতুর্দিকে যে নালা কাটা হয়েছে এবং যেখানে সারা বছরই পানি থাকে, তার পরিমাণ আনুমানিক ৮ শতক। আর তৃতীয় অংশটি হচ্ছে নালার পাশ ঘেঁষে উঁচু করা যে ডাইক বা রাস্তা, তার পরিমাণ প্রায় ১১ শতক। তিন অংশের পরিমাণটুকু একেবারে নির্দিষ্ট নয়, আনুমানিক।

এবার দেখা যাক 'ঘের'কে ঘিরে চাষাবাদের দিকটি। প্রথমেই বিবরণ দেই প্রধান অংশটির। বছরের দুই ঋতুতে বাহ্যিকভাবে এর রূপ দুইটি। বর্ষাকালে বৃষ্টির পানি পড়লে নালাসহ অংশ (প্রায় ৪৩ শতাংশ জমি) দেখতে হয় পুকুরের মত। আর গ্রীষ্মকালে পানি শুকিয়ে গেলে হয়ে যায় সমতল ভূমি (৩৫ শতাংশ নালার অংশ ছাড়া। বর্ষাকালে সেই পুকুরে সাধারণত মাছের চাষ হয়। কিছুটা লোনা পানির কারণে সেখানে প্রধানত চিংড়ি মাছ চাষের লক্ষ্য থাকে কৃষকদের। সংগে অন্যান্য মাছ, যেমন রুই, কাতলা ইত্যাদিরও চাষ করা হয়। পানির পরিমাণ কম থাকলে ধানেরও চাষ করা হয় একই সঙ্গে। আর গ্রীষ্মকালে পানি শুকিয়ে গেলেও জমিতে যথেষ্ট আর্দ্রতা থাকে। সে সময়টায় নানা জাতের রবি ফসলের চাষ করা হয়।

কল্পনা-বিকাশ গত বছর পুকুরের অংশে চিংড়ি, রুই ও কাতল মাছের চাষ করেছিলেন, ধানের চাষ করেননি। তাদের হিসাব মতে প্রায় ৩০,০০০-৪০,০০০ টাকার মাছ বিক্রয় হয়েছিল। আর গ্রীষ্মকালে ঐ ৩৫ শতাংশ জমিতে ফুলকপি, বাঁধাকপি এবং আলুর চাষ করেছিলেন। প্রায় ৮,০০০-১০,০০০ টাকার রবি ফসল বিক্রি করতে পেরেছিলেন বলে জানান তারা। ঘেরের দ্বিতীয় অংশ যেটুকু নালা তাতে পুরো বছরই পানি থাকে, ফলে মাছও থাকে। নালার পানি দিয়ে প্রয়োজনে গ্রীষ্মকালে শাক-সবজিতে সেচ দেওয়া হয়। নালার মাছ তাদের কথা অনুযায়ী আলাদা বিক্রি করা হয় না। বছরে ঐ এক সময় মাছ বিক্রি করা হয়। তৃতীয় অংশটি হচ্ছে ডাইক। আনুমানিক ১১ শতাংশ জায়গা। এর ব্যবহার খুবই বৈচিত্র্যপূর্ণ। অনেক ধরনের ফসলের চাষ হয় এ অংশে। কোনটা বাৎসরিক ফসল, কোনটা ঋতুভিত্তিক। একটু বিস্তারিত জানার উদ্দেশ্যে সব ধরনের ফসলের খোঁজ না দিয়ে গত বছর যে ফসলগুলি চাষ হয়েছে তা নিয়েই আলাপ সীমাবদ্ধ ছিল। নিচে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো।

(১) বেগুন: বেগুন একটি বাৎসরিক ফসল। লাগানোর ৩০-৩৫ দিন পর থেকেই ফসল তোলা যায় এবং সারা বছরই অর্থাৎ ১১ মাসই ফসল কাটা যায়। সাধারণত তারা সপ্তাহে ১ দিন ফসল তুলে বিক্রি করেন। প্রায় ৪ শতক জমিতে রোপণ করে প্রতি সপ্তাহে গড়ে ৩০-৩৫ কেজি বিক্রি করেছেন। দর পেয়েছেন প্রতি কেজিতে গড়ে ৩০ টাকা। চালনা বাজারে নিয়ে বিক্রি করেছেন। সারাবছরই নগদ টাকায় বিক্রি করেছেন।

(২) করল্লা: করল্লা লাগিয়েছিলেন এক শতক জমিতে। গাছের সংখ্যা ছিল ৪০টি। আষাঢ় মাসে বীজ বপন করে শ্রাবণ মাস থেকেই করল্লা তোলা শুরু। কার্তিক মাস পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় ৪ মাস যাবত করল্লা তুলেছেন। প্রতি মাসে গড়ে ৫ বার করে ফসল তুলতে পেরেছেন। হাইব্রিড জাতীয় প্রায় ৪-৫ ফসলে প্রতিবার গড়ে ২৫ কেজি করল্লা পেয়েছেন। বিক্রি করেছেন গড়ে ২০ টাকা কেজি দরে চালনা বাজারে।

(৩) লাউ: আষাঢ় মাসে লাউয়ের বীজ বপন করেছেন প্রায় ১.৫ শতক জমিতে। ৩৫-৪০ দিন পর থেকেই লাউ তোলা শুরু। তোলা যায় প্রায় ৩ মাস পর্যন্ত। দেড় শতক জমিতে ১০-১২টা গাছ লাগিয়ে পুকুরের দিকে মাচা করে দিলে লাউ গাছ বেড়ে ওঠে তরতর করে। লাউ গাছের ডগা সাধারণত বিক্রি করেন না। এটি বিক্রি করতে গেলে ঝামেলা হয় বলে মনে করেন। এমনকি লাউ হাটেও নিয়ে যান না। এখানেই পাইকাররা এসে নগদ টাকায় কিনে নিয়ে যান। প্রতিটি লাউ বিক্রি করেন ৩৫-৪০ টাকা মূল্যে। এ বছর কমপক্ষে ২৫০০-৩০০০ টাকার লাউ বিক্রি করেছেন।

(৪) মানকচু: কতটুকু জমিতে মানকচু চাষ করেছেন জিজ্ঞাসা করলে বিকাশ বললেন, এই হিসাব আমি আপনাকে দিতে পারব না। কারণ বলতে গিয়ে বললেন, মানকচু লাগানো হয় পাড়ের ঢালু অংশে। তাই জমির পরিমাণ পরিমাপ করা যায় না। ঢালু জমিতে এক হাত দূরে দূরে ৫০টি মানকচু লাগিয়েছেন। পৌষ-মাঘ মাসে এটি তোলা হয়। এক গাছ থেকে প্রায় ২৫০ কেজি কচু পাওয়া যায়। প্রতি কেজি কচু বিক্রি করেছেন ৩৫ টাকা দরে।

(৫) পেঁপে: এ বছরই পেঁপের চাষ করেছেন প্রথম। এর আগের বছর একটা পেঁপে গাছে অনেক পেঁপে ধরেছিল। একটা পেঁপে প্রায় ২-২.৫ কেজি ওজনের। প্রায় ২০-২৫টা পেঁপে ধরেছিল গাছটাতে। দেখে ভাল লেগেছিল বিকাশের। তাই একটা পেঁপের বীজ রেখে তা থেকে চারা উৎপাদন করে

প্রায় ১০০টা পেঁপে গাছ লাগিয়েছেন এ বছর ৫ শতক জমিতে। পেঁপেও বাৎসরিক ফসল। গাছগুলি এখন বেশ মোটাতাজা হয়ে উঠেছে। গাছের চেহারা দেখে ভাল ফসলের আশা করছেন।

এটি গত বছরের চিত্র। এ ছাড়াও ডাইকে অন্যান্য বছর আরও বিভিন্ন ফসল যেমন শিম, শসা, বরবটি, ঝিংগা এবং এমনি ধরনের আরও ফসলের চাষ করা হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গত বছরে এই পরিবার তাদের নিজস্ব ঘেরে কোন ধান উৎপাদন করেননি। এমন অবস্থা অনেক কৃষকেরই। বিষয়টি জানতে চাইলে তারা বললেন যে, তারা ১০ কাঠা অর্থাৎ ২৫ শতাংশ জমি বর্গা চাষ করেন। বর্গাকৃত জমিটি ঘের নয়, সেখানে বছরে শুধু একটি ফসল হয়– আমন ধান। ইরি-২৩ ধানের চাষ করেছিলেন। ফলন পেয়েছিলেন ১২ মণ। ৫ মণ ধান ৯০০ টাকা দরে বিক্রি করে ৪৫০০ টাকা জমির মালিককে দিয়ে দিয়েছেন, বাকি ৭ মণ ধান রেখেছেন নিজের খোরাকির জন্য।

'ঘের'-এ চাষাবাদ সম্পর্কে অধিকাংশ তথ্যই দিয়েছেন কল্পনা মিস্ত্রি। বোঝা গেল এগুলি দেখাশুনা করেন তিনিই। বাজারজাত ও উপকরণাদি সংগ্রহের কাজগুলি করেন বিকাশ মিস্ত্রি। 'কোডেক' নামের একটি 'এনজিও'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কল্পনা মিস্ত্রি। নানা বিষয়ে তিনি প্রশিক্ষণ পান এখান থেকে। কল্পনা ও বিকাশ মিস্ত্রির বর্ণনা থেকে ঘেরের চাষাবাদ সম্পর্কে কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

(১) এতে সারা বছরই কোন না কোন ফসলের চাষ হতেই থাকে।

(২) ফসল তোলার পদ্ধতি অনুসারে (কোনটি সপ্তাহে ১ বার, কোনটি দুই সপ্তাহে একবার অথবা কোনটি মৌসুম শেষে) সারা বছরই বিক্রির মাধ্যমে নগদ টাকার আদানপ্রদান হয়।

(৩) বাড়িতে বসে অথবা নিকটস্থ বাজারে নগদ টাকায় উৎপাদিত দ্রব্যাদি বিক্রয় হয়। বাকিতে কোন বিক্রি হয় না।

প্রবন্ধের শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ৮০র দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে স্থানীয়ভাবে 'ঘের' পদ্ধতির চাষাবাদ শুরু করা হয়। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এলাকায় এ চাষ পদ্ধতিকে উন্নত এবং স্থায়িত্বপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে জলবায়ু-বান্ধব জমির (climate-smart agrculture) প্রবর্তনে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সরকার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সহায়তায়। সেজন্য সম্প্রতি মাছ-ফসলের ইউনিট-প্রতি উৎপাদনের হারও বাড়ছে। ২০১৩ সালের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ঘেরের কৃষকরা ৩০% উৎপাদন খরচ কমিয়ে পূর্বাপেক্ষা ৭ গুণ আয় বাড়াতে সক্ষম হয়েছেন। 'ঘের' অঞ্চলের কৃষির প্রতি তাই বহু সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগে আগ্রহী হচ্ছে।

লেখক: বার্ড-কুমিল্লার সাবেক পরিচালক

আর্তনাদের দাবি

মিঠুন দেব

জুনিয়র অফিসার (এমআইএস), সিদীপ

নিঃশব্দ কালোরাত বীভৎস ভয়ার্ত চিৎকার
দেখিনি আমি, শোনা হয়নি আমার
তবু অন্তর কোঠায় জমে আছে ঐ পিশাচদের তরে সহস্র ধিক্কার।
শুনতে পারিনি আমি ভাষার মিছিলের টগবগে স্লোগান,
দেখিনি আমি ৭১এর শিহরিত ভয়াল মুক্তিযুদ্ধ।
সবুজ-শ্যামলের আবেগপ্রবণ মানুষগুলো সেদিন কীভাবে
হয়ে উঠেছিল পর্বতশৃঙ্গসম ক্রুদ্ধ।
একটি ভাষার জন্য, একটি মানচিত্রের জন্য
কতশত প্রাণ নিমিষেই হয়েছে বলিদান।
তন্দ্রার মাঝে আজও আমি কাতরে উঠি, ধরে রেখেছি কি
তোমাদের বিজয়ের প্রাণোচ্ছল সম্মান।
যারা রক্ত-পিপাসুর নৃত্যে মেতে উঠেছিল সেদিন
কালো হাতের থাবায় নিষ্পেষিতভাবে বাংলাকে করেছে হরণ
এখন চোখের পলকে কি নিদারুণ ঝলকে
তাদেরি করি পুষ্পমাল্যে দানে বরণ।
জানি আমি অনুধাবন করি তোমাদের আত্মার চিৎকার
শুনতে পারি অস্পষ্ট ভোরে আর্তনাদের করুণ হাহাকার।
রক্তগঙ্গায় স্নান করে মায়ার বন্ধন নিশ্চিহ্ন করে
স্বাধীন মানচিত্রের নিশান এনে দিয়েছো মোদের তরে।
হে জাতি জেগে ওঠো, তন্দ্রা ঝেড়ে উঠুক অগ্নিক মনুষ্যত্ব
গড়ে তোলো সততা দিয়ে একতার কঠোর ভিত।
বহতা নদীর জলধারায় জীবনকে করো অর্পণ
নিজ জাতিকে নরপিশাচের কাছে কখনো করো না সমর্পণ।
যারা রাইফেল আর মেশিনগানের সামনে হাসিমুখে দিয়েছে প্রাণ
তারা সূর্য হতে আসা পর্বতসম সমুদ্রসন্তান,
চির অমর হয়ে অটুট থাক তাদেরি স্বর্ণসম্মান।
উন্নতির উচ্চ শিহরণে ধাবিত হোক মোর বাংলা
সত্য সাহসের ধরে হাত
মুছে যাক সকল গ্লানি, উদিত হোক মিষ্টি প্রভাব
বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই সকল শহীদের, এগিয়ে যেতে চাই বারেবার
ঠাঁই যেন না হয় রক্তমাখা মুখোশের–
এই হোক মোদের অঙ্গীকার।

কচুরিপানা নিয়ন্ত্রণ ও পানির উপরে মাচায় পেঁয়াজের চারা উত্তোলন

প্রফেসর ড. মো. আমিন উদ্দিন মৃধা

কচুরিপানা নিয়ন্ত্রণ

কচুরিপানা পাবনার বিল গাজনায় পেঁয়াজ চাষের ক্ষেত্রে একটি বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ জলাশয়ে একবার জন্মালে কচুরিপানা নির্মূল করা অত্যন্ত কঠিন। বর্তমানে ব্যবহৃত শারীরিক (Physical), যান্ত্রিক (Mechanical) এবং রাসায়নিক (Chemical) পদ্ধতিগুলো ব্যয়বহুল এবং মানসম্মত নয়। কারণ যেকোন প্রচেষ্টার লক্ষ্য হলো অর্থনৈতিক ব্যয় ও পরিবেশগত ক্ষতি হ্রাস করা। আর এ ক্ষেত্রে জৈবিক (Biological) নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিই হলো দীর্ঘমেয়াদী এবং টেকসই সমাধান যা কচুরিপানা নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনায় মূল ভূমিকা নিতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে কোন পদ্ধতিই সব পরিস্থিতিতে উপযুক্ত নয়।

কিছু অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও শারীরিক বা দৈহিক পদ্ধতি ব্যবহার করে বিল গাজনায় কৃষকদের ক্ষেত থেকে কচুরিপানা অপসারণ করে সমস্যাটি হ্রাস করা যেতে পারে। এ পদ্ধতিতে কৃষকেরা জলাশয় থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কচুরিপানা সংগ্রহ করে তাদের জমিতে গাদা করে পচিয়ে ফেলবে। দ্রুত পচানোর জন্য বাজার থেকে বিভিন্ন ধরনের পচনে সাহায্যকারী উপাদান/বিভিন্ন অণুজীব/ট্রাইকোডার্মা ছত্রাক ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারে। এছাড়া কচুরিপানা কিছু দিন রেখে দিলে শুকিয়ে পরিমাণে কমে গেলে কিছু পরিমাণ জমিতে জ্বালিয়ে এবং অবশিষ্টাংশ সার হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু বর্তমান পেঁয়াজ চাষের সময়ে এটি মোটেও উপযুক্ত নয়। কারণ এই পদ্ধতিতে যথেষ্ট পরিমাণ লোকবল প্রয়োজন। সেইসাথে এটি সময় ও অর্থসাশ্রয়ী নয়। আমরা জানি, জমি পরিষ্কার না করে, জমিকে আবাদযোগ্য না করে জমিতে পেঁয়াজ চাষ সম্ভব নয়। তাই বিল গাজনা অঞ্চলে বর্তমান মৌসুমে পেঁয়াজ চাষ করতে গেলে কৃষককে অতিরিক্ত অর্থনৈতিক ক্ষতির বোঝা বইতে হবে। যেহেতু বিল গাজনা দেশের একটি প্রধান পেঁয়াজ উৎপাদক অঞ্চল। সুতরাং বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে এই অঞ্চলে পেঁয়াজ চাষের জন্য কৃষকদের মাঝে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নগদ অর্থ বিতরণ করতে পারে। কারণ বিল গাজনা অঞ্চলে পেঁয়াজ উৎপাদনে ব্যর্থ হলে আগামী মৌসুমে পর্যাপ্ত পেঁয়াজ উৎপাদন করা দেশের জন্য একটি বিশাল সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে।

যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি শারীরিক পদ্ধতির সাথে কমবেশি সম্পর্কিত। এই পদ্ধতিতে মানুষের হাতের বদলে যন্ত্রের মাধ্যমে কচুরিপানা অপসারণ করা হয়। এটি ব্যয়বহুল পদ্ধতি কারণ এর সাথে মানুষ, যন্ত্র এবং অর্থ জড়িত। এছাড়া মেশিন চালানোর জন্য উপযুক্ত স্থানের প্রয়োজন যা বিল গাজনার জন্য উপযুক্ত নয়। বরং পাবনার ইছামতি নদীর কচুরিপানা সমস্যা দূরকরণের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে সংগৃহীত কচুরিপানা শুকিয়ে রান্নার কাজে এবং সেই ছাই সংগ্রহ করে সার হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

যেকোন বিচারে রাসায়নিক পদ্ধতিকেই বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও নির্ভরযোগ্য কৌশল বলে মনে করা হয়। তবে এ পদ্ধতির সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলো এটি জল এবং আশেপাশের উপাদানকে দূষিত করে। শারীরিক ও যান্ত্রিক পদ্ধতি বর্তমান সময়ে বিল গাজনার জন্য উপযুক্ত নয় বলে রাসায়নিক পদ্ধতি ব্যবহার করে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে কচুরিপানা দূর করে জমিকে পেঁয়াজ চাষের উপযুক্ত করতে পারি। তবে পাবনার বিল গাজনা অঞ্চলে কচুরিপানা নিয়ন্ত্রণে জৈবিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিই উপযুক্ত, টেকসই ও কার্যকর বিকল্প পদ্ধতি বলে মনে হয়। যদিও আমাদের কাছে এই মুহূর্তে কচুরিপানার সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় সঠিক প্যাথোজেন, জৈব-ওষুধ এবং অ্যালিলোপ্যাথিক গাছ নেই।

কচুরিপানা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে সর্বাধিক উপযুক্ত পদ্ধতি শনাক্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জৈবিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি কচুরিপানার দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থাপনার জন্য সবচেয়ে বেশি দক্ষ ও পরিবেশগত সুরক্ষা পদ্ধতি। যান্ত্রিক এবং রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলি স্বল্পমেয়াদি ফলাফলের জন্য কার্যকর। তবে তারা জলাশয়ের পরিবেশগত অবস্থার উপর মারাত্মকভাবে প্রভাব ফেলতে পারে। তাই সবদিক বিবেচনা করে কচুরিপানা ব্যবস্থাপনার জন্য শারীরিক, যান্ত্রিক, রাসায়নিক এবং জৈবিক এই চার পদ্ধতিই পৃথকভাবে বা সংমিশ্রণে ব্যবহৃত হতে পারে।

পানির উপরে মাচায় পেঁয়াজের চারা উত্তোলন

কী করে পানির উপরে মাচায় পেঁয়াজের চারা উত্তোলন করা যায়? এই মুহূর্তে পাবনার গাজনার বিল এলাকায় পানিবদ্ধতার কারণে কৃষক ভাইয়েরা নির্দিষ্ট সময়ে জমিতে বীজ ফেলে সহজেই চারা জন্মাতে পারছেন না। ফলে চারার অভাবে নির্দিষ্ট সময়ে পেঁয়াজ চাষ করা সম্ভব হবে না। এতে চাষের সময় পিছিয়ে যাবে এবং প্রকৃত ফলন থেকে কৃষক ভাইয়েরা বঞ্চিত হবেন। আর এতে কৃষকের পাশাপাশি রাষ্ট্রেরও আর্থিক ক্ষতি হবে প্রচুর।

এখানে উল্লেখ করতে চাই যে, মাটিতে সহজেই বীজতলা তৈরি করে চারা জন্মানো যায় কিন্তু জলাবদ্ধতার কারণে মাচায় বীজতলা তৈরিতে কৃষক ভাইয়েরা অতিরিক্ত খরচের পাশাপাশি আরো নানারকম সমস্যার সম্মুখিন হবেন। কিন্তু যে পরিমাণ খরচ হবে তার চাইতে অনেক বেশি লাভবান হবেন যদি নির্দিষ্ট সময়ে চারা জন্মানো যায় মাচাং পদ্ধতিতে।

এখন আমি বলব একজন কৃষক কী করে খুব সহজেই অল্প খরচে মাচাং তৈরি করবেন। আমরা সবাই বাঁশের মাচাং তৈরি করতে জানি বা দেখেছি। প্রচলিত পদ্ধতিতে আমরা নৌকায় যে ভাবে মাচাং তৈরি করি সে ভাবেই আমরা বীজতলা প্রস্তুতের মাচাং তৈরি করতে পারি। আমরা একটি বাঁশ থেকে ১০-১৫ ফুট লম্বা করে ৬ বা ৮টি বাতা তৈরি করব। এক্ষেত্রে খরচ কমানোর জন্য বাঁশের বাতা ছাড়াও

পাটকাঠি বা ধঞ্চের কাঠি অথবা তাদের সুবিধামত কোন বিকল্প জিনিসও ব্যবহার করতে পারেন। এরপর বাতাগুলি আমাদের সুবিধামত একসাথে গেঁথে ৩-৪ ফুট চওড়া একটি মাচা তৈরি করে নেব। মাচার উপরে ছোট ছিদ্রযুক্ত মোটা পলিথিন বিছিয়ে দেব।

এবার বীজতলার জন্য একটি উপযুক্ত মাটির মিশ্রণ তৈরি করে (মাটি, গোবর, সার মিশিয়ে) পলিথিনের উপর ২ ইঞ্চি পুরু করে বিছিয়ে দেব। এর আগে বাঁশের চিকন অংশ বা গাছের শক্ত ডাল কেটে খুঁটি তৈরি করে পানিতে গেড়ে মাচাংটিকে খুঁটিগুলির সাথে নির্ধারিত জায়গায় ঝুলিয়ে দেব। এবার কৃষক ভাইয়েরা যেভাবে মাটির বীজতলায় বীজ বপন করেন ঠিক সেভাবেই এই মাচাংয়েও বীজ বপন করবেন এবং যত্ন নেবেন।

আমি আশা করবো কৃষক ভাইয়েরা এই ধরনের বীজতলা সহজেই তৈরি করতে সমর্থ হবেন। যারা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী নন তাদেরকে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সহায়তায় ব্যাংক থেকে সহজ শর্তে স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ ছাড়াও জনপ্রতিনিধিরা কৃষকভাইদের কোন প্রকার প্রণোদনার ব্যবস্থা করা যায় কিনা তাও স্থানীয় কৃষিবিভাগের সহায়তায় চেষ্টা করতে পারেন। যে ভাবেই হোক না কেন, কৃষক ভাইদের এই দুঃসময়ে কিভাবে সহযোগিতা করা যায় তা সকলকেই ভাবতে হবে।

আমরা এই পদ্ধতি ব্যবহারের জন্য একটি পরীক্ষামূলক মাচাং ইতোমধ্যেই স্থানীয় সংসদ সদস্য জনাব আহমেদ ফিরোজ কবির মহোদয়ের সার্বিক সহযোগিতায় প্রস্তুত করেছি। আপনারা হাতেকলমে শেখার জন্য চাইলেই আমাদের উদ্ভাবিত পানির উপরে মাচায় পেঁয়াজ চারা উত্তোলন পদ্ধতি সরেজমিনে পরিদর্শন করতে পারবেন। এছাড়া কৃষক ভাইয়েরা চাইলে আমার সাথে সরাসরি যোগাযোগও করতে পারবেন। *- ২১ জানুয়ারি ২০২১*

লেখক: সাবেক উপাচার্য, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়; বর্তমানে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কৃষি ও সমবায় বিষয়ক কেন্দ্রীয় উপ-কমিটির সদস্য।

শ্রীধরকুড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বই উপহার ও বঙ্গবন্ধু বুক কর্নার

এ বছর শুরুর দিকে ৪ ফেব্রুয়ারি ভোরে ঢাকা থেকে রওনা দিলাম পাবনায় কাশীনাথপুরের উদ্দেশ্যে। নিকটবর্তী শ্রীধরকুড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমার প্রিয়তম বন্ধু ও একইসঙ্গে শ্রদ্ধাভাজন মো. তারেকুজ্জামানের নিমন্ত্রণে। তিনি আমার জানা ও দেখা মহত্তম শিক্ষকদের একজন। বন্ধুবৎসল, সৎপরামর্শকারী, সবসময় সাহায্যকারী, সৎচিন্তাশীল, জ্ঞানানুরাগী, কল্যাণকামী, সত্যনিষ্ঠ এক মহান ব্যক্তি ও শিক্ষক তিনি। তাঁর স্কুলে বঙ্গবন্ধু বুক কর্নারে কিছু বই ও একটি বুক শেলফ প্রদানের এক ছোট্ট অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে কিছু বই দেয়া হয়েছে। এছাড়াও তিনি বই সংগ্রহ করছেন শিশুদের উপযোগী একটি সুন্দর ও সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার গড়ে তোলার জন্য। তাঁর এই প্রচেষ্টায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন আমাদের আরেক বন্ধু বর্তমানে কানাডা-প্রবাসী লে. কর্নেল (অব.) জাকির হোসেন। প্রিয় বন্ধু জাকির অনেকদিন ধরেই সমাজে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ প্রসার নিয়ে ভাবছেন। তার মতে, শিশুজীবনেই এই নৈতিকতার বীজ সবচেয়ে ফলপ্রসূ হয়। তাই শিশুদেরকে নৈতিকভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে। সে উদ্দেশ্যে তারেক ভাইয়ের স্কুলটিতে সে কিছু বই ও একটি বুকশেলফ উপহার দেয়।

বই ও বুকশেলফ প্রদানের এ চমৎকার অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত ছিলেন সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা জনাব জাহিদুল হক। তারেক ভাইয়ের অনুরোধে জনাব জাকিরের দেয়া বইগুলো তার পক্ষে অনুষ্ঠানে আমি দেই। এ সময় শিক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়ে কিছু কথা ও গল্প হয়। উপজেলা শিক্ষা অফিসার জনাব জাহিদুল হক অত্যন্ত উদার ও সৎ চিন্তাশীল একজন চমৎকার মানুষ। খোলামেলা অনেক কথা হলো। চমৎকার একটা দুপুর বিকালে গড়ালো।

(বাম থেকে) প্রধান শিক্ষক মো. তারেকুজ্জামান, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা জাহিদুল হক এবং আলমগীর খান

স্কুলটিকে এত সুন্দর করে গড়ে তোলা হয়েছে যে দুপুরের খাবারের পর শীতের মিষ্টি রোদে সামনের মাঠে বসে গল্প করতে করতে আর উঠতেই মন চাচ্ছিলো না। তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায় ...।

বিকালে আবার কাশীনাথপুরে আনন্দ পাঠাগার ও প্রয়াস সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর প্রাণচঞ্চল, উদ্যমী, সাহসী ও স্বপ্নবান একঝাঁক তরুণযুবা লেখক-সাংস্কৃতিক কর্মীর সঙ্গে কাটলো চমৎকার এক মন উজ্জ্বল-করা সন্ধ্যা।

নবরূপে গড়ে ওঠা শ্রীধরকুড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সৃষ্টিশীল কার্যক্রম, সাফল্য ও উন্নতির ফলে যেন তার হাজার হাজার শিশু সুন্দর ও মহৎ মানুষ হয়ে বেড়ে ওঠে এবং সমাজ ও জাতির গর্ব হয় সেই আন্তরিক প্রার্থনা রইলো। - *আলমগীর খান*

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে

সিদীপে রচনা/গল্প/কবিতা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে সিদীপ আয়োজিত “বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ” শীর্ষক রচনা/গল্প/কবিতা প্রতিযোগিতায় যেসব রচনা, গল্প ও কবিতা পাওয়া গেছে তা মূল্যায়ন করে ৩ জনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। তারা হলেন:

ক. রচনা:	বিউটি ইয়াছমিন	শিক্ষা সুপারভাইজার, পূবাইল শাখা, আশুলিয়া এরিয়া
খ. গল্প:	মোঃ শাহপরান চৌধুরী	ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, মদনপুর-২ ব্রাঞ্চ, সোনারগাঁও এরিয়া
গ. কবিতা:	মনসুর আলম মিন্টু	ফিল্ড অফিসার, জামশা ব্রাঞ্চ, চারিগ্রাম এরিয়া

করোনা-দুর্যোগজনিত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে বিজয়ীদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কৃত করা হবে।

সিদীপে বঙ্গবন্ধু উচ্চ শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান-২০২১

(বাম থেকে) মিফতা নাঈম হুদা, আব্দুল আউয়াল, মোঃ ফসিউল্লাহ, শাহজাহান ভূঁইয়া এবং এস. আবদুল আহাদ

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে গৃহীত অন্যান্য কর্মসূচির পাশাপাশি সিদীপ তার অসচ্ছল সদস্যগণের সন্তানদের জন্য "বঙ্গবন্ধু উচ্চ শিক্ষাবৃত্তি" প্রদানের কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির "বঙ্গবন্ধু উচ্চ শিক্ষাবৃত্তি নীতিমালা ২০২০"-এর আলোকে সংস্থা ১৫ জন উচ্চ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদানের জন্য মনোনীত করেছে। ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ দুপুরে সিদীপের প্রধান কার্যালয়ে এই শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়।

উক্ত বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এমআরএ-র এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফসিউল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন সিডিএফ-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব আব্দুল আউয়াল ও এমআরএ-র সহকারি পরিচালক (পিএস টু ইভিসি) জনাব সৈয়দ আশিক ইমতিয়াজ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিদীপের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব শাহজাহান ভূঁইয়া।

বঙ্গবন্ধু উচ্চ শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন সিদীপের নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদা। বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন সিদীপের জিএম (মানবসম্পদ বিভাগ) বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব সৈয়দ লুৎফর রহমান। দেশের বিভিন্ন জেলা-উপজেলা থেকে আগত ১৫ জন উচ্চশিক্ষার্থীর প্রত্যেকের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনাব মোঃ ফসিউল্লাহ।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে আগত প্রত্যাশী বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয়ের শিশুশিক্ষার্থী কর্তৃক একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।

(বাম থেকে) মোঃ আবদুল কাদির সরকার, এ. কে. এম. হাবিব উল্লাহ আজাদ, মনসুর আলম, মিফতা নাঈম হুদা, শাহজাহান ভুঁইয়া, এস. আবদুল আহাদ এবং ছাঈদ আহাম্মেদ খান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্মদিবস পালন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে সিদীপে তাঁর ১০১তম জন্মদিবস পালন এবং 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন সংস্থার ভাইস চেয়ারম্যান জনাব শাহজাহান ভুঁইয়া, পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপক জনাব মনসুর আলম, সিদীপের নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদা ও সিদীপের অতিরিক্ত পরিচালক জনাব এ কে এম হাবিব উল্লাহ আজাদ। সবশেষে কবিতা আবৃত্তি করেন মিঠুন দেব।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সিদীপ প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত হয় আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মিফতা নাঈম হুদা ও পরিচালক (ফিন্যান্স এন্ড অপারেশন্স) এস. আবদুল আহাদসহ প্রধান কার্যালয়ের প্রায় সকল কর্মকর্তা-কর্মী এতে উপস্থিত ছিলেন। আলোচনায় অংশ নেন সিদীপের বিভিন্ন কর্মী। বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন সংস্থার ভাইসচেয়ারম্যান জনাব শাহজাহান ভুঁইয়া। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করেন আলমগীর খান, মাঈনুল ইসলাম ও মিঠুন দেব। সঙ্গীত পরিবেশন করেন নিশি, সুমী, পলাশ, জাহিদ, মোহাম্মদ আলী, মিঠুন ও মনজুর শামস।

আমাদের শিক্ষা

কাকলী খাতুন

একটি জাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য শিক্ষা বা জ্ঞানের কোন বিকল্প নেই। আবার শিক্ষার ফলে অর্জিত জ্ঞানকে বলা হয়েছে শক্তি। শিক্ষার অভাবে জন্ম নেয় কুসংস্কার যা জাতিকে পেছনের দিকে টানে। এ অন্ধকার দূর করতে হলে দরকার শিক্ষার।

শিক্ষার অন্তরায়: বাড়তি জনসংখ্যা, দারিদ্র্য, শিক্ষিত অভিভাবকের অভাব, সচেতনতার অভাব, ভালো মানের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বল্পতা এসব আমাদের দেশের শিক্ষার উন্নতির অন্তরায়। এটা সত্য সময়ের সাথে সাথে অভিভাবকদের সচেতনতাও বৃদ্ধি পেয়েছে শিক্ষার ক্ষেত্রে। তাই তারা তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠান। কিন্তু আমাদের দেশে বিদ্যালয়ের পড়াশুনার ধরন অনুযায়ী তাকে প্রতিদিন শিক্ষক-শিক্ষিকা কিছু পড়া দেন বা অন্য ধরনের কিছু কাজ দেন। যেটা সে বাড়ি থেকে তৈরি করে আসে। পরিবারের কেউ তাকে সাহায্য করতে না পারায় তার পক্ষে পড়াশুনাটা যেন খুব জটিল বলে মনে হতে থাকে। এক্ষেত্রে লেখাপড়ার প্রতি তার অনাগ্রহ সৃষ্টি হতে থাকে। যার দরুন ঝরে পড়ার হার বৃদ্ধি পায়।

শিক্ষার উদ্দেশ্য: আমাদের শিক্ষা সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণা ভ্রান্ত। সনদপত্র নয়, আত্মশক্তি অর্জনই যে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য তা আমরা বিশ্বাস করতে কুণ্ঠাবোধ করি। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা পুরোটাই এখন বাণিজ্যনির্ভর। রমরমাভাবে চলছে শিক্ষার এ বাণিজ্য। শিক্ষা অর্জন এখন অনেক বড় প্রতিযোগিতা। এ অশুভ ও অসুস্থ প্রতিযোগিতার পেছনে দৌড়াচ্ছে শিক্ষার্থীদের সাথে অভিভাবকরা। অভিভাবকের কাছে সন্তানের জন্য একটা ভালো চাকুরি যেন মুখ্য উদ্দেশ্য। আমাদের সমাজে শিক্ষা মানে কতিপয় সার্টিফিকেট লাভের মাধ্যমে একটা চাকরি জোগাড় করা। প্রকৃত পক্ষে নিজেকে জানা বা নিজের সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভ করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য যা আমরা ভুলতে বসেছি।

প্রকৃত জ্ঞানার্জন: শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ নিজের ক্ষমতা ও শক্তির বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়। শিক্ষার ফলে মানুষের আত্মপ্রত্যয় বা আত্মবিশ্বাসের উন্মেষ ঘটে। কিন্তু আমাদের দেশে শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে পরীক্ষায় পাস করার মাধ্যমে সার্টিফিকেট লাভ এবং একটি চাকুরির ব্যবস্থা করা। ফলে আমাদের আত্মশক্তির জাগরণ ঘটছে না। আমরা স্কুল কলেজে ছেলেমেয়েকে পাঠিয়ে ভাবি যে, ছেলেমেয়েকে শিক্ষা দেবার সমস্ত কর্তব্য পালন করলাম। বছরের পর বছর পাস করলেই অভিভাবকেরা ছেলেমেয়ের যথেষ্ট তারিফ করেন। কিন্তু তারা দেখেন না যে কেবল পাস করলেই বিদ্যা অর্জন হয় না। বাস্তবিক পক্ষে ছাত্রের বা সন্তানের মনে জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ এবং শ্রদ্ধার উদ্ভব হচ্ছে কিনা সেটাই দেখাবার জিনিস। জ্ঞানচর্চার স্বাদ গ্রহণের ইচ্ছা জন্ম দেওয়াই হচ্ছে স্কুলকলেজের শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য। প্রকৃত জ্ঞানস্পৃহা না থাকলে শিক্ষা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, তখন পরীক্ষা পাসটাই বড় হয় এবং পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠায় জ্ঞান সীমাবদ্ধ থাকে। এ কারণেই পরীক্ষায় পাস করা লোকের অভাব নেই। আমাদের দেশে অভাব আছে জ্ঞানী ব্যক্তির।

পরিবারের ভূমিকা: বাড়ি হলো একটি শিশুর প্রথম বিদ্যালয়। পরিবারে প্রথম পাঠ তার মনের বিকাশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সে বাড়িতে দেখেশুনে শিক্ষালাভ করতে শুরু করে। বাড়িতে তার চরিত্র গঠিত হয়। একটি ভালো পরিবারেই সৎ এবং স্বাস্থ্যবান মানুষ তৈরি হয়। শিশুর মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে পরিবার মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। মায়ের ভূমিকা অনেকাংশে বেশি। আমাদের দেশে যদিও শিক্ষার হার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তথাপি নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্যটা এখনো দূর হয়নি। সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু শিক্ষিত মায়ের সংখ্যা অনেক কম।

শিক্ষক সমাজ: প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের স্বল্পতা লাঘব করা গেলে শিক্ষার উন্নয়ন আরো দ্রুত গতিতে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব। একজন ভালো শিক্ষক যে কোনো দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। বাংলাদেশে ভালো শিক্ষকের প্রয়োজন। একজন ভালো শিক্ষক পাঠকে চিত্তাকর্ষক করতে পারেন। প্রত্যেকের মাঝেই মূল্যবান কিছু থাকে। একজন ভালো শিক্ষক প্রত্যেকের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারেন।

শিশুর মানসিক বিকাশের ব্যবস্থা: শিশুর মানসিক বিকাশে বিনোদন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একঘেঁয়েমিপূর্ণ যে কোনো কিছুই বিরক্তিকর। সিদীপ এই বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দিয়ে প্রতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবার সাংস্কৃতিক ক্লাসের মধ্য দিয়ে শিশুর মনের ভেতরের অনুভূতিগুলোকে আত্মপ্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছে। সুস্থ থাকার অনেক ভালো একটা উপায় হলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা। সিদীপ পাঠক্রমের পড়া তৈরিতে সহায়তার পাশাপাশি আরো যে কার্যক্রমগুলো করে থাকে যেমন পরিচ্ছন্ন থাকা, প্রকৃতি সম্পর্কে জানা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, বড়দের শ্রদ্ধা করা এগুলো একটি শিশুর আদর্শ চরিত্র গঠনে সহায়ক। এতে তাদের ভেতরে লুক্কায়িত প্রতিভাগুলো প্রকাশের সুযোগ পায়।

শিক্ষার প্রভাবেই মানুষ নানা কুসংস্কার ও সংকীর্ণতার বেড়া ডিঙিয়ে যেতে পারে উন্নতির লক্ষ্যে। তাই শিক্ষাকে জাতির মেরুদণ্ড বলা হয়। পবিত্র কুরআনে ও হাদীসে শিক্ষাকে আলো ও অশিক্ষাকে অন্ধকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আলো যেমন পৃথিবীকে অন্ধকার থেকে মুক্তি দেয় তেমনি শিক্ষার পরশে ব্যক্তি ও সমাজ লাভ করে প্রগতি। বৈষয়িক তথা অর্থনৈতিক মুক্তির সোপান শিক্ষা।

লেখক: শিক্ষা সুপারভাইজার, দেবোত্তর ব্রাঞ্চ, সিদীপ

‘আমাদের শিক্ষা : নানা চোখে’ বই নিয়ে রচনা-প্রতিযোগিতা

গত বছর ঢাকায় প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত প্রশিক্ষণে প্রত্যেক শিক্ষাসুপারভাইজারকে ‘আমাদের শিক্ষা: নানা চোখে’ বইটি দেয়া হয়েছিল এবং বইটির ওপর একটা রচনা-প্রতিযোগিতার ঘোষণা করা হয়েছিল। প্রাপ্ত রচনাসমূহের মধ্য থেকে ২৩টি সেরা লেখা বাছাই করা হয়েছে। করোনা-দুর্যোগজনিত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সেরা রচনা-লেখকদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কৃত করা হবে।

রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী

ক্রমিক	শিক্ষা সুপারভাইজারের নাম	ব্রাঞ্চ	এরিয়া	মন্তব্য
১	রহিমা আক্তার	গাজীপুর সদর	গাজীপুর	১ম
২	ফাহমিদা জেসমিন	বাঘা	রাজশাহী	২য়
৩	শাহিন আখতার	বজরা	বজরা	৩য়
৪	মাফরোজা খাতুন	বাগাতিপাড়া	নাটোর	সেরা
৫	মরিয়ম আক্তার	পোড়াবাড়ী	গাজীপুর	সেরা
৬	হাছিনা নার্গিস	আড়াইহাজার	সোনারগাঁ	সেরা
৭	নিলুফা আক্তার	শ্রীকাইল	সলিমগঞ্জ	সেরা
৮	কিসমোতারা খাতুন	শিবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	সেরা
৯	কুলসুম বিবি	মাথাভাঙ্গা	তিতাস	সেরা
১০	রেহানা আক্তার	উয়ারুক	হাজীগঞ্জ	সেরা
১১	মর্জিনা আক্তার	সীতাকুণ্ড	চট্টগ্রাম	সেরা
১২	তাহামিনা আক্তার	সোনারগাঁ	সোনারগাঁ	সেরা
১৩	সালমা খাতুন	ভাঙ্গুড়া	পাবনা	সেরা
১৪	সুমি খাতুন	বনপাড়া	বড়াইগ্রাম	সেরা
১৫	শারমিন আক্তার	নলডাঙ্গা	নাটোর	সেরা
১৬	রুবিনা আক্তার	বিটঘর	ধরখার	সেরা
১৭	আজমিরা খাতুন	গোপালপুর (লালপুর)	বড়াইগ্রাম	সেরা
১৮	মোরশিদা আক্তার	বারেরা	মোহনপুর	সেরা
১৯	সুমি আক্তার	রাজাপুর	বড়াইগ্রাম	সেরা
২০	নাহিদা হক	ভোলাচং	সলিমগঞ্জ	সেরা
২১	সাদিয়া সুলতানা	আশুলিয়া	আশুলিয়া	সেরা
২২	মাহমুদা আক্তার	হায়দারাবাদ	কুটি	সেরা
২৩	বিজলী আক্তার	ময়নামতি	ময়নামতি	সেরা

রাষ্ট্র শক্তিশালী হলেই মাতৃভাষা শক্তিশালী হবে

মাহবুবুল ইসলাম

ভাষার মাস বিদায় নিয়েছে, চলছে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর বছর। ভাষার মাসে বিভিন্ন রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মহিলা, শিশু-কিশোর সংগঠনসমূহের কার্যক্রমের মধ্যে ছিল শহীদদের স্মরণে শোভাযাত্রা, আলোচনা সভা ইত্যাদি। মুদ্রণ, বেতার, আকাশ মাধ্যম এবং হালের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসমূহ এই মাসে প্রবন্ধ প্রকাশ, আলোচনাসহ নানা ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। সব আয়োজনেই রাষ্ট্রের সর্বস্তরে বাংলা চালু না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে। সর্বস্তরে বাংলা চালু নিয়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইতিমধ্যে বহু সিদ্ধান্ত হয়েছে, এমনকি সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলায় বিচারের রায় লেখার জন্য বিচার বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত বিচারকদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন।

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ 'বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি' এবং 'শিক্ষালোক'-এর যৌথ উদ্যোগে সিদীপ কার্যালয়ে 'ভাষার লড়াই: বাংলায় জ্ঞানচর্চা' শীর্ষক একটি আলোচনা সভায় ভাল উপস্থিতিসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সুযোগে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকেও অনেকে আলোচনায় অংশ নিয়েছেন। আলোচকবৃন্দ তথ্য-অভিজ্ঞতা বর্ণনার মাধ্যমে সর্বস্তরে বাংলার প্রচলন ও জ্ঞানচর্চা কার্যকর না হওয়ার জন্য প্রধানত দেশের শিক্ষানীতি ও শিক্ষার একাধিক মাধ্যমকে দায়ী করেছেন।

উপস্থিত আলোচকদের মধ্যে বিজ্ঞানানুরাগী অসিত সাহার আলোচনা অনেকটা ব্যতিক্রমী ছিল। তিনি বলেছেন, "ভাষা তখনই শাক্তিশালী হবে যখন রাষ্ট্র শক্তিশালী হবে, আর রাষ্ট্র শক্তিশালী হবার পূর্ব শর্ত হচ্ছে রাষ্ট্রের কর্মক্ষম জনশক্তিকে উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত করা। তবেই সর্বস্তরে বাংলা চালু হবে এবং বাংলা ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা অগ্রসর হবে।" তিনি আরও বলেছেন, "বাংলা ভাষাকে শক্তিশালী করার জন্য বাংলাদেশকেই নেতৃত্ব দিতে হবে।"

তার বক্তব্যের সূত্র ধরে বলা যায় যে, বিশ্বের সকল উন্নত দেশের, জনসংখ্যা বিবেচনায় যতই কম হোক না কেন, রাষ্ট্র পরিচালনার ভাষা, ব্যবসা-বাণিজ্যের ভাষা, আইন-আদালতের ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ভাষা তাদের মাতৃভাষা। বিশ্ব সাহিত্য-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জনের প্রয়োজনে ভিনদেশী ভাষা শিক্ষায় তাদের আগ্রহ কম নয়। তবে তা নিজের ভাষাকে বাদ দিয়ে নয়।

ব্রিটিশরা এ উপমহাদেশে পণ্য নিয়ে এসেছিল বাণিজ্যের আশায়। সাথে নিয়ে এসেছিল তাদের ভাষা। বাণিজ্যের প্রয়োজনে তাদের ভাষা শিক্ষা দিয়ে এদেশে একটি দালাল শ্রেণি গড়ে তুলেছিল এবং তাদের শাসন-শোষণ পাকাপোক্ত করার স্বার্থে এই জনপদের সাধারণের ভাষা উপেক্ষা করে অফিস আদালতে চালু করেছিল তাদের ইংরেজি ভাষা। আর আইন প্রণয়ন করেছিল তাদের ইংরেজি ভাষায়, যা সাধারণের বোধগম্য ছিল না। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠি ব্রিটিশদের মত এ দেশে তাদের কোন পণ্য নিয়ে আসেনি, তারা চেয়েছিল এদেশের পণ্যে তাদের ভাষা ব্যবহার করে বাণিজ্য করতে। তাই এদেশ শাসন-শোষণের জন্য প্রথমে চেয়েছিল তাদের ভাষা চাপিয়ে দিতে, যা এদেশের বাংলাভাষী মানুষ প্রতিহত করতে পেরেছিল। এ কাজে ব্যর্থ হয়ে তারা ব্রিটিশদের রেখে যাওয়া ইংরেজিকে পরিবর্তন করার প্রয়োজন বোধ করেনি। স্বাধীনতার পরে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ভিনদেশীদের ষড়যন্ত্র অনুধাবন করতে না পারার কারণে স্বাধীন দেশের সংবিধান রচিত হয়েছে ভিনদেশী ভাষায়।

কোন ভিনদেশী শক্তি বাংলা ভাষাকে শক্তিশালী করে দিবে না। কোন প্রকল্প প্রণয়ন করেও হবে না। ভাষা শক্তিশালী করতে হলে রাষ্ট্রকে শক্তিশালী হতে হবে। আর রাষ্ট্র শক্তিশালী করতে হলে রাষ্ট্রের অর্থনীতি হতে হবে উৎপাদনমুখী। দালালির অর্থনীতি দিয়ে রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করা যাবে না। এজন্য কর্মক্ষম জনশক্তিকে সম্পদে পরিণত করে উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে এবং উৎপাদিত পণ্যে বাংলার ব্যবহার থাকতে হবে। পাশাপাশি পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টি করতে হবে।

মূলত বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরায় বাংলাভাষী মানুষের বসবাস। এছাড়া জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে বাংলাভাষী মানুষ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। সব মিলে এদের সংখ্যা জাতিসংঘের তথ্য মতে প্রায় ২৫ কোটি হলেও বাস্তবে তা ৩৫ কোটির কম হবে না। এক সময়ে পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা ছিল এই বিশাল জনশক্তির ভাষা বাংলায় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র। কলিকাতার মানুষ এখন ইংরেজি ও হিন্দির চাপে বাংলাকে ভুলতে বসেছে। তা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ, আসাম কিংবা ত্রিপুরা রাষ্ট্র হিসেবে পূর্ণাঙ্গ নয়। তাই এ বিষয়ে তাদের বেশি কিছু করার নেই। এ ক্ষেত্রে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকেই বাংলা ভাষা শক্তিশালী করার নেতৃত্ব দিতে হবে। এজন্য রাজনৈতিক অবস্থান শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

লেখক: গবেষক ও সমাজকর্মী

ভাষার লড়াই: বাংলায় জ্ঞানচর্চা

(বাম থেকে) অনার্য নাঈম ও নাজনীন সাথী, আলমগীর খান, আশরাফ আহমেদ, সালেহা বেগম, ফজলুল বারি, কুদরতে খোদা, শহিদুল ইসলাম এবং সৈয়দ বদরুল আহসান

"আমাদের কেন বলতে হয় ভাষার লড়াই আজো শেষ হয়নি, বাংলায় জ্ঞান চর্চা কর? তার কারণ বহু হতে পারে; বির্তকও হতে পারে প্রচুর কিন্তু শিক্ষালোক এবং 'বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি' পত্রিকা মনে করে এর প্রধানতম কারণ হলো দেশপ্রেমহীনতা, ব্যক্তিগত স্বার্থ, দলীয় স্বার্থ, গোষ্ঠীগত স্বার্থপরতা ও ক্ষমতার চর্চা। ইংরেজি চর্চার যেসব অজুহাত দেখানো হয় তা আসলে হীনমন্যতা এবং অক্ষমতা ছাড়া কিছু নয়। অক্ষমতা কেন? এর উত্তর আজকের আলোচনায় বিজ্ঞ আলোচকদের কাছ থেকে আমরা পাবো নিশ্চয়। বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি পত্রিকা সম্পূর্ণত বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি চর্চাকে গুরুত্ব দেয়। অন্য ভাষা-সংস্কৃতি চর্চার রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে। ভাষা যেহেতু যোগাযোগের মাধ্যম সেহেতু অন্যভাষা জানা-বোঝার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকারের কিছু নেই। তার জন্যে দশ-পনের বছরব্যাপী স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাসের চর্চার কি দরকার? আসল কথা আজকের এই কর্পোরেটোক্রেসির যুগে সবকিছুর সাথে ভাষাও একটি বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত।"

শিশির মল্লিকের এ লিখিত বক্তব্য দিয়ে ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১এ শুরু হয় 'ভাষার লড়াই: বাংলায় জ্ঞানচর্চা' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানটি। ছোটকাগজ 'বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি' এবং শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন 'শিক্ষালোকে'র যৌথ উদ্যোগে আলোচনা সভাটি হয় সিদীপ কার্যালয়ে। এতে অনলাইনে

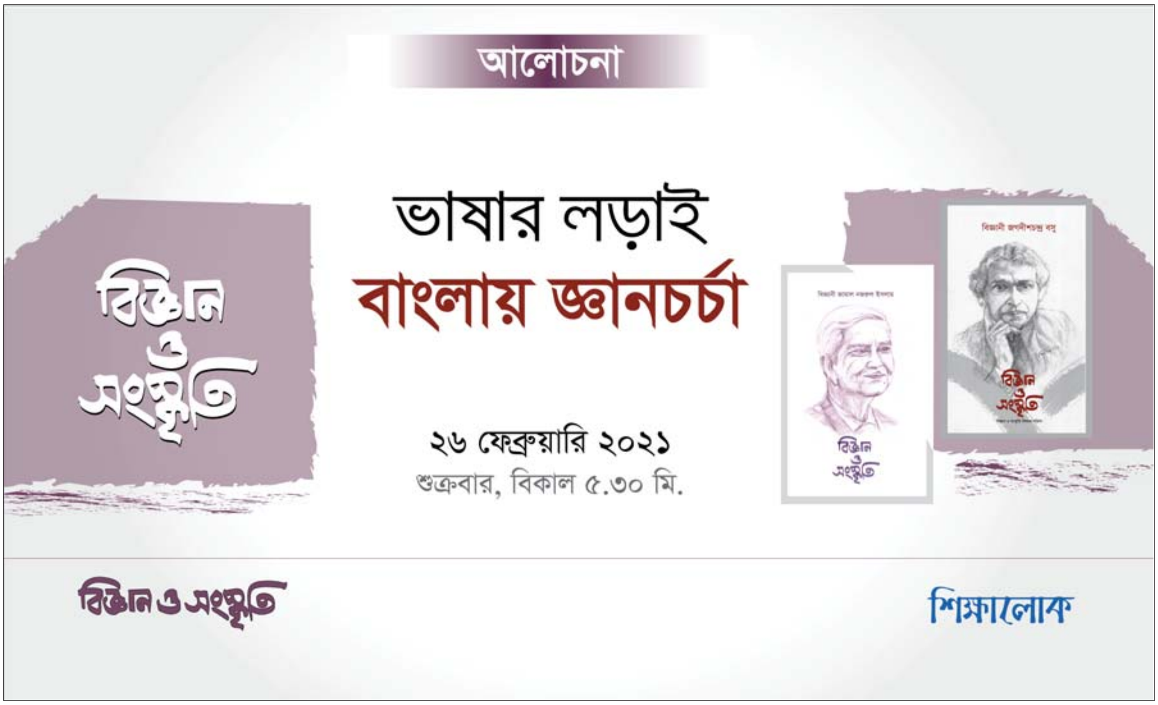

আলোচনায় অংশ নেন 'বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি'র প্রধান সম্পাদক বিজ্ঞানী ড. আশরাফ আহমেদ, অধ্যাপক কুদরতে খোদা, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সৈয়দ বদরুল আহসান, শিক্ষাবিদ শহিদুল ইসলাম ও গবেষক ফজলুল বারি।

সরাসরি আলোচনায় অংশ নেন লেখক ও উন্নয়নচিন্তক শাহজাহান ভূঁইয়া, বিজ্ঞানুরাগী অসিত সাহা, কবি ও চিত্রশিল্পী জাহিদ মুস্তাফা, কবি সৈকত হাবিব, সাংবাদিক শাহেরীন আরাফাত, লেখক তাপস বড়ুয়া, লেখক-গবেষক সিরাজুদ দাহার খান, লেখক মারুফ ইসলাম এবং কবি ও প্রভাষক জয়নাব বিনতে হোসেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন লেখক-গবেষক সালেহা বেগম। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন 'বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি'র সম্পাদক আলমগীর খান ও নির্বাহী সম্পাদক নাজনীন সাথী।

মন্ট্রিল থেকে অনলাইনে আলোচনায় জনাব কুদরতে খোদা বলেন, স্বাধীনতার এত বছর পরেও যে আমাদেরকে বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠা নিয়ে কথা বলতে হচ্ছে তা ভাবা যায় না। তবে সম্প্রতি উচ্চ আদালতে রায় বাংলায় লেখার জন্য যে সিদ্ধান্ত হয়েছে তাকে তিনি আশাব্যঞ্জক মনে করেন। অবশ্য এরকম অনেক সিদ্ধান্ত আগেও হয়েছে, কিন্তু বাস্তবায়িত হয়নি। তিনি বলেন জাপান ও চীনের মত দেশ যারাই উন্নতি লাভ করেছে তারা প্রমাণ করেছে মাতৃভাষা চর্চার মাধ্যমেই সত্যিকার উন্নয়ন সম্ভব।

খ্যাতনামা সাংবাদিক সৈয়দ বদরুল আহসান আমাদের কথায় কথায় বিশেষত রেডিও-টেলিভিশনের অনুষ্ঠানগুলোয় বাংলার সঙ্গে যথেচ্ছ ইংরেজি ব্যবহারের দুঃখজনক প্রবণতার উল্লেখ করেন। আবার আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডেও আমাদের প্রমিত বাংলা ব্যবহারের পরিবর্তে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। অনেকের ইংরেজি ঢঙে বাংলা উচ্চারণের বাতিকের কথাও বলেন তিনি।

অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম প্রকৃত উন্নয়ন কী সেই প্রশ্ন করেন এবং বলেন আগে শিক্ষার দর্শন ঠিক করতে হবে।

বিজ্ঞানী ও লেখক আশরাফ আহমেদ বলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু বাংলায় বিজ্ঞান বিষয়ে লিখেছেন। তিনি বলেন শিক্ষক যদি বাংলায় বিজ্ঞান বোঝাতে না পারেন তবে তিনি নিজেই বিষয়টি বোঝেন না।

গবেষক ফজলুল বারি মাতৃভাষায় জ্ঞানচর্চার ব্যাপারে জাপানিদের আগ্রহ নিয়ে তার অভিজ্ঞতা থেকে কিছু বিষয় তুলে ধরেন এবং আমাদেরও সর্বস্তরে মাতৃভাষা ব্যবহারের প্রয়োজনের কথা বলেন।

আলোচনা অনুষ্ঠানের সভাপতি লেখক সালেহা বেগম বলেন, এরকম ছোট ছোট উদ্যোগ সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে।

চৌকস চাষি দম্পতি আমেনা-মুনসুরের নতুন স্বপ্ন সূর্যমুখীতে

মো. ইসরাফিল হোসেন

নিজেদের ভাগ্য তারা নিজেরাই গড়ছেন। দারিদ্র্যকে রূপান্তরিত করেছেন ঐশ্বর্যময় সৃষ্টিশীলতায়। অভাবে অভাবে মুখ থুবড়ে পড়তে থাকা সংসারকে সৃষ্টিশীল মেধা আর লড়াকু কর্মস্পৃহায় সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের পথে নিয়ে এসেছেন। এখন সূর্যমুখী ফুলের চাষে নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন স্বপ্ন দেখছেন চৌকস চাষি দম্পতি আমেনা বেগম ও মুনসুর আলী। এভাবেই তারা তাদের এগিয়ে চলায় যোগ করে চলেছেন উদ্‌ভাবনের বৈচিত্র্যময় মাত্রা। আর তাদের উন্নয়নযাত্রায় ঋণ সহায়তার জন্য সব সময়েই পাশে থাকছে সিদীপ।

কৃষিতে এই সাফল্য-কাহিনি গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলার মাওনা ইউনিয়নের সিংগারদিঘী গ্রামের মোছাম্মৎ আমেনা বেগমের। জীবনসঙ্গী মো. মুনসুর আলী তার এই কৃষি উদ্যোগেও সার্বক্ষণিক বিশ্বস্ত সাথী। এক সময়ে তাদের সংসারে অভাব-অনটন লেগেই থাকত। নিজেদের ২ বিঘা জমি যদিও ছিল, কিন্তু টাকার অভাবে সেই জমিতে ফসল ফলানো সম্ভব হতো না। সংসার চালানোর জন্য আমেনার স্বামী মুনসুর প্রায় সারা বছরই অন্যের জমিতে শ্রম বিক্রি করত। খুবই অল্প কয়েকটা দিন নিজেদের জমিতে কাজ করার সুযোগ পেতো। এভাবেই জোড়াতালি দিয়ে কোনো রকমে চলছিল তাদের সংসার।

আমেনা বেগমের পরিবারের সদস্য চারজন। স্বামী-স্ত্রী এবং দুই সন্তান–এক ছেলে ও এক মেয়ে। অভাবের কারণে সন্তানদের পড়ানোর কথা ভাবতেও পারতেন না। স্বামী-স্ত্রী দুজনে দিনরাত হাড়ভাঙা পরিশ্রম করার পরও তাদের সংসারের অভাব কখনো দূর হতো না। সেই দুর্দিনে আমেনা বেগম প্রতিবেশীদের কাছ থেকে জানতে পারেন, সিদীপ নামে একটি সংস্থা দরিদ্র পরিবারের লোকদের বিভিন্ন ধরনের ঋণ সহায়তা দিয়ে থাকে, যার কিস্তি প্রতিমাসে বা সপ্তাহে পরিশোধ করতে হয়। এছাড়া সংস্থাটি আরো এক ধরনের ঋণ দেয়, যার কিস্তি ছয় মাস বা এক বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে পরিশোধ করতে হয়। এককালীন পরিশোধের এ বিষয়টি তার খুব ভাল লেগে যায় এবং তার মধ্যে এ ঋণ নেয়ার আগ্রহ জাগে। বিষয়টি নিয়ে আমেনা বেগম তার স্বামীর সাথে আলোচনা করেন এবং ঋণের টাকা দিয়ে

তাদের জমিতে এবং আরো জমি লিজ নিয়ে তাতে বিভিন্ন সবজি চাষ করে লাভের টাকা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব এবং লাভবান হওয়া সম্ভব বলে তার স্বামীকে জানান। স্ত্রীর ভাবনা বাস্তবসম্মত মনে করে স্বামী মুনসুর আলী তার কথায় সম্মত হন এবং সিদীপ থেকে ঋণ নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এরপর আমেনা বেগম ২০১৪ সালের ৭ জুলাই মাওনা ব্রাঞ্চে সিদীপের সদস্য হয়ে সাধারণ ঋণ গ্রহণ করেন এবং ২০১৮ সালে সিদীপ থেকে কৃষিঋণ বা এসএমএপি ঋণ নেয়া শুরু করেন। প্রথম ধাপে ২০১৪ সালের ১ সেপ্টেম্বর ৬০,০০০ টাকা সাধারণ ঋণ গ্রহণ করেন এবং এ টাকা দিয়ে তিনি তার দুই বিঘা জমির সাথে আরো এক বিঘা জমি লিজ নেন এবং সেখানে লাল শাক, পালং শাক, মরিচ, ফুলকপি, বাঁধাকপি, গাজর, মুলা ইত্যাদি সবজি চাষ করেন। তার সবজির ফলন খুব ভালো হয় এবং ভালো দামে সেগুলো বিক্রি করেন। এরপর ২০১৫ সালের ৮ আগস্ট ৮০ হাজার টাকা সাধারণ ঋণ নেন এবং তার আগের তিন বিঘা জমির সাথে আরো দুই বিঘা জমি লিজ নেন এবং একইভাবে বিভিন্ন সবজি চাষ করতে থাকেন। তৃতীয় ধাপে ২০১৬ সালের ১৬ জুলাই ১ লাখ টাকা সাধারণ ঋণ নেন। এ টাকা দিয়ে পাঁচ বিঘা জমিতে একইভাবে বিভিন্ন সবজি চাষ করেন এবং একটি ষাঁড় কেনেন। সেটিকে মোটাতাজা করে পরে বিক্রি করেন। ২০১৭ সালের ১০ আগস্ট চতুর্থ ধাপে ১ লাখ টাকা সাধারণ ঋণ নেন। এবার তিনি তার সবজি খেত হতে লাভের টাকা এবং ষাঁড় বিক্রির লাভের টাকা দিয়ে একইভাবে বিভিন্ন সবজি চাষ করেন এবং তিনটি এঁড়ে বাছুর কিনে মোটাতাজা করে বিক্রি করেন। পঞ্চম ধাপে ২০১৯ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি ৬০,০০০ টাকা সাধারণ ঋণ নেন এবং এ টাকা দিয়ে তিনি তার আগের পাঁচ বিঘা জমির সাথে আরো তিন বিঘা জমি লিজ নিয়ে সবজি চাষ করেন। ২০২০ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি ৮০ হাজার টাকা সাধারণ ঋণ গ্রহণ করেন এবং সে টাকা দিয়ে তার সবজি খেতে সেচ দেয়ার জন্য একটি সেচ পাম্প স্থাপন করেন।

বর্তমানে আমেনা বেগম আট বিঘা জমিতে সবজি চাষ করছেন এবং তার সাতটি বড় গরু এবং দুইটি বাছুর রয়েছে। এর মধ্যে দুটি গাভী রয়েছে, যা থেকে দিনে ১২ থেকে ১৫ লিটার দুধ পাচ্ছেন। পরবর্তীতে সিদীপ কর্মকর্তারা তাকে শ্রীপুর উপজেলা কৃষি কমকর্তা এবং মাওনা ইউনিয়ন পরিষদের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেন এবং বর্তমানে তিনি কৃষি অফিস থেকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন। ধীরে ধীরে তার শ্রীপুর উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তার সাথেও যোগাযোগ হয় এবং এসব যোগাযোগের ভিত্তিতে তিনি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে কৃষি ও প্রাণিসম্পদ সম্পর্কে বেশ ভালো জ্ঞান অর্জন করেছেন। পাশাপাশি সিদীপ থেকে আয়োজিত বিভিন্ন কৃষি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতেও তিনি নিয়মিত অংশ নিয়ে থাকেন।

আমেনা বেগম প্রথম ৩০,০০০ টাকা এসএমএপি ঋণ নেন ২০১৯ সালের ১০ ডিসেম্বর। এ ঋণের টাকা দিয়ে তিনি তার জমিতে শিম, লাউ, ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো এবং ধান চাষ করেন। ছয় মাসে আমেনা বেগম তার সবজি খেত থেকে প্রায় ৯০,০০০ টাকার সবজি বিক্রি করেন এবং সব খরচ বাদ দিয়ে তার লাভ হয় ৪০,০০০ টাকা। দ্বিতীয় দফায় ২০২০ সালের ৯ জুলাই ৪০ হাজার টাকা এসএমএপি ঋণ নেন। এ ঋণের টাকা আগের লাভের টাকার সাথে মিলিয়ে ৬০ হাজার টাকা দিয়ে সবজি চাষ করেন ও গরুর বিভিন্ন খাদ্য কেনেন।

আমেনা বেগম এসএমএপি ঋণ নেয়ার আগে টেকনিক্যাল ওরিয়েন্টেশনের সময় মাওনা ইউনিয়নের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার সঙ্গে পরিচিত হন এবং তিনি তাকে দুই বিঘা জমিতে সূর্যমুখী ফুল চাষের জন্য বীজ ও ফুল চাষে সার্বিক সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন। তিনি তার ছয় বিঘা জমিতে চক্রাকার পদ্ধতিতে সবজি চাষ শুরু করেন, যাতে সব সময় তার সবজি খেত থেকে সবজি বিক্রি করতে পারেন এবং বাকি দুই বিঘা জমিতে সূর্যমুখী ফুল চাষ করেন।

বর্তমানে আমেনা বেগম তার সবজি খেত থেকে প্রতি সপ্তাহে প্রায় ৩০ হাজার টাকার সবজি বিক্রি করেন। তার খরচ হয়েছিল প্রায় ১৮ হাজার টাকা। এছাড়া তার সূর্যমুখী ফসলের অবস্থাও ভাল এবং সব সময় এই ফসলের কোনো সমস্যা বা রোগবালাই হচ্ছে কিনা তা দেখতে সিদীপের কৃষি কর্মকর্তা এবং মাওনা ইউনিয়ন পরিষদের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন। আমেনা বেগম বলেন এই ফসল উৎপাদন করতে তার জমি, সার, জমি চাষ, সেচ, নিড়ানি ও কর্তন বাবদ প্রায় ১৫ থেকে ১৮ হাজার টাকা খরচ হবে। বর্তমানে ফসল যে অবস্থায় আছে তাতে এ ফসল বিক্রি করে প্রায় ৬০ থেকে ৭০ হাজার টাকা পাওয়া যাবে। আমেনা বেগম ও তার স্বামী মুনসুর আলী জানান, সূর্যমুখী ফুল চাষ করে এক মৌসুমে ৪৫ থেকে ৫২ হাজার টাকা লাভ করা সম্ভব। তারা ঠিক করেছেন আরো বেশি জমিতে সূর্যমুখী ফুল চাষ করবেন, যাতে তাদের জীবনেও সূর্যের হাসি ফোটে।

ভীষণ অভাবে নাকানি-চুবানি খেতে থাকা সেই আমেনা বেগম এখন তার আগের টিনের বেড়ার ঘর ভেঙে ইটের ঘর নির্মাণের জন্য ইট কিনেছেন এবং স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখে সংসার করছেন। ছেলে-মেয়ে পড়াশোনা করছে। নিজেদের সাফল্যে গর্বিত আমেনা জানান, পরিশ্রম করলে সাফল্য আসবেই। তবে তার জন্য সঠিক পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ দরকার।

লেখক: উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, গাজীপুর জোন, সিদীপ

শুঁটকি ব্যবসায় দারিদ্র্য ঘুচিয়ে মিরা রানী এখন সফল উদ্যোক্তা

মো. আতিকুল ইসলাম

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ উপজেলার লালপুর এলাকাটি নদী, খাল, বিলবেষ্টিত। এখানকার মানুষের আয়ের প্রধান উৎস মাছ চাষ, ছোটখাটো ব্যবসা ও কৃষি। লালপুরের কান্দাপাড়ায় বসবাস করেন শতাধিক জেলে পরিবার। মাছ ধরে বিক্রি করেই চলে এসব পরিবার। তবে বর্তমানে এসব পরিবারের অনেকেই পুঁটি মাছের সিদল/চেপা শুঁটকি তৈরি ও বিক্রি করে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করেছেন। হ্যাঁ তাদেরই একজন মিরা রানী।

মিরা রানীর যখন বিয়ে হয় তখন তার স্বামী নদীতে মাছ ধরে বিক্রি করে খুব কষ্টে সংসার চালাতেন। অভাব-অনটনের সংসার ছিল। স্বামী বিকাশ দাসের পক্ষে কিছুতেই পরিবারের অভাব অনটন থেকে বের হওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। দিনদিন পরিবারের সদস্য সংখ্যা বাড়তে থাকে। বর্তমানে ৫ মেয়েসহ তার পরিবারের সদস্য ৭ জন। আয়ের একটি বাড়তি পথ খুঁজতে খুঁজতে এক সময় মিরা রানীর স্বামী মাছ ধরে বিক্রির পাশাপাশি মাছ শুকিয়ে শুঁটকি তৈরি করে স্থানীয় বিভিন্ন সাপ্তাহিক হাটে বিক্রি করতে থাকেন। দিনদিন এতে ভালো লাভ হতে থাকে। তখন মিরা রানীর স্বামী বিকাশ দাস ভাবতে থাকেন শুঁটকির ব্যবসাটাকে কীভাবে আরও বড় করা যায়। বিষয়টি নিয়ে তিনি মিরা রানীর সাথে আলাপ করেন। আলোচনা করে দুজনেই ঠিক করেন শুঁটকি ব্যবসাটা আরো বড় করবেন। কিন্তু অর্থের অভাবে তা সম্ভব হচ্ছিল না। অগত্যা মিরা রানী তার কিছু সোনার অলঙ্কার বিক্রি করে ১ লাখ টাকা দিয়ে পুঁটি মাছ কিনে শুকিয়ে শুঁটকি তৈরি করে বাজারের পাশাপাশি বিভিন্ন আড়তে বিক্রি করতে থাকেন। এভাবে চলতে থাকে মিরা রানী ও বিকাশ দাসের সংসার।

শুঁটকি থেকে আয় বাড়তে থাকায় তাদের এ ব্যবসা আরো বড় করে তোলার ইচ্ছেটাও বাড়তে থাকে। তারা স্বপ্ন দেখেন ব্যবসাটাকে আরও বড় করার এবং পাশাপাশি একটি আড়ত খুলবেন। এমন অবস্থায় ২০১৭ সালে তাদের আলাপ হয় সিদীপের একজন কর্মীর সাথে। বিকাশ দাস তার স্বপ্নের কথা কর্মীকে জানালে সেই কর্মী তাকে জানিয়েছিলেন, সিদীপ তাকে এ ব্যাপারে আর্থিক সহায়তা দিতে পারে। তার পরামর্শক্রমে মিরা রানী সিদীপের সেখানকার একটি মহিলা সমিতিতে যোগ দেন এবং ঋণের আবেদন করেন। যাচাই শেষে তার ঋণ প্রস্তাব অনুমোদন করে ২০১৭ সালের ৬ জুন তাকে ৪৮,০০০ টাকা ঋণ দেয়া হয়। এই টাকা দিয়ে পুঁটি মাছ কিনে সেগুলো কুটে মাচা/ডাংগির মধ্যে শুকিয়ে মাটির মটকিতে ভরে তারা গুদামজাত করেন। এভাবে তাদের ব্যবসার পরিধি বাড়তে থাকে এবং এই দম্পতি তাদের আড়তে আরও ৮-১০ জন কর্মীকে নিয়োগ দেন। এভাবে এক বছর কাটার পর ২০১৮ সালে মিরা রানী সিদীপ থেকে আরও ১,৫০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে তা ব্যবসায় বিনিয়োগ করেন। ধীরে ধীরে তাদের ব্যবসার পরিধি এবং লোকবল বাড়তে থাকে। এরপর মিরা রানী ২টি শুঁটকির আড়তের মালিক হন এবং ২০ জন কর্মচারী নিয়োগ করেন।

এভাবে ধীরে ধীরে মিরা রানী ও বিকাশ দাসের শুঁটকির ব্যবসা বাড়ছে। তাদের শুঁটকির চাহিদা দিন দিন বাড়তে থাকায় তারা উৎপাদন আরও বাড়ানোর চিন্তাভাবনা করেন। কিন্তু তাদের কাছে যে পরিমাণ অর্থ ছিল তাতে উৎপাদন সেভাবে বাড়ানো সম্ভব হচ্ছিল না। অগত্যা তারা আবারও সিদীপের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সিদীপ বরাবরের মতো তাদের পাশে দাঁড়ায় এবং তাদেরকে ৩,০০,০০ টাকা ঋণ প্রদান করে। এই টাকা দিয়ে তারা পুঁটি মাছের পাশাপাশি লইট্যা, পোয়া, বাইন ইত্যাদি মাছ কিনে শুকিয়ে শুঁটকি তৈরি করে এলাকার চাহিদা মিটিয়ে দেশের বিভিন্ন জেলায়

বাজারজাত করতে থাকেন এবং তাদের আয় বেশ বাড়তে থাকে। বর্তমানে তাদের ব্যবসায় ৫০ লাখ টাকার পুঁজি রয়েছে। এখন প্রতি মাসে তাদের মাসিক আয় গড়ে ২ লাখ টাকা। শুঁটকি ব্যবসায় দারিদ্র্য ঘুচিয়ে এভাবেই এখন মিরা রানী একজন সফল উদ্যোক্তা।

লেখক: ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, লালপুর বাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সিদীপ।

এসএমএপি কৃষি সদস্যের ধান কাটায় সহায়তা

চলমান লকডাউনে কৃষি সদস্যদের ধান কাটায় সহায়তা করছেন সিদীপের কৃষি কর্মকর্তারা। এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহে সিদীপের পাবনা জোনের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা মো. জাহিদ হোসেন দেবোত্তর শাখার রাধাকান্তপুর মহিলা সমিতির এসএমএপি কৃষি সদস্য সালমা বেগমের কৃষিকাজের খোঁজখবর নিতে গিয়ে দেখেন গ্রামের অন্য কৃষকেরা ধান কাটতে পারলেও তিনি তখনো তার খেতের ধান কাটতে পারেননি। এ অবস্থায় তিনি সালমা বেগমের স্বামী মো. হাবিবুর রহমানকে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি কম্বাইন্ড হার্ভেস্টের মাধ্যমে ধান কাটার পরামর্শ দেন এবং মোবাইল ফোনের মাধ্যমে এই যন্ত্রের মালিক আব্দুল বারেকের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেন। অবশেষে জাহিদ হোসেনের মধ্যস্থতায় এপ্রিল মাসের ২৫ তারিখে সালমা বেগম কম্বাইন্ড হার্ভেস্টের মাধ্যমে ধান কাটতে সক্ষম হন। তার ধান কাটার সফলতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সিদীপের এই শাখার কর্ম-এলাকার কোদালিয়া গ্রামের কৃষকরাও এই পদ্ধতিতে ধান কাটায় আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং শাখাটির অন্যান্য কর্মকর্তা এ ব্যাপারে সহায়তায় তাদের পাশে দাঁড়ান।

Review

Amar Maa Ebong Onyo Shobar Maa by Mr. Fazlul Bari

Afroza Khanam

লেখক-গবেষক ও বার্ড-কুমিল্লার সাবেক পরিচালক ফজলুল বারির একটি লেখা শিক্ষালোকে (এপ্রিল-জুন ২০১৮ সংখ্যা) প্রকাশিত হয়েছিল, যার শিরোনাম: 'আমার মা এবং অন্য সবার মা: বিংশ শতাব্দীতে মধ্যবিত্তের সামাজিক উন্নয়নে মায়েদের ভূমিকা'। লেখাটি পড়ে একজন পাঠক তার মন্তব্য লেখককে ইমেইলে জানান। জনাব আফরোজা খানম ঢাকায় একটি কলেজে অধ্যাপনা করছেন। তার ইংরেজিতে লেখা মূল্যবান এ মন্তব্য এখানে প্রকাশ করছি। – সম্পাদক

Firstly it was an absolute delight and honour to be able to read and review this well-thought out article by Fazlul Bari. The perspective of this article is thought provoking and enlightening which highlights an aspect which would otherwise go unnoticed. The writer has beautifully called attention to the remarkable contribution in the social development of the middle class family in the twentieth century.

His anecdotal style of narration makes the reader feel a personal relationship with the article where they can also evaluate the role their own mothers played in the developments of their lives. The writer makes various important points throughout the article and includes statistics which support his claims aptly. He also mentions the source of the statistics in the footnote which makes the points more valid and the article praiseworthy.

The writer has described the socio-economic aspect of the early twentieth century precisely and given a crystal clear picture so that anyone is able to understand the circumstances back then. He has also described the rise of the educated middle class who in turn have shaped the era of development in Bangladesh. In doing so he has made excellent connections between the contribution of mothers and the development of the society.

He has narrated three specific incidents from his past about two distinctive mother figures in his life. From those incidents he has skillfully extracted the characteristics of mothers during that time which have contributed to the success of the middle class. He has pointed out that though these women may not have had formal education but they possessed great intelligence, prudence, wisdom and excellent decision making power which has led to the ultimate betterment of the society. The writer has also made a very significant point on how the mothers not only helped their own children but also played remarkable roles in the lives of others. They provided shelter, care, love and affection to others such as relatives and neighbours which helped them to study and improve their lives. They not only nurtured their own children but provided the same affections to others which helped speed up the process of development. Lastly he makes another very important point where he applauds the support the women provided to their husbands at that time. The women were very patient, respectful and devoted to their husbands. The husband was the source of finance while the wives handled the expenditure and management of the funds making appropriate decisions.

Lastly, I would like to appreciate the thought provoking nature of this article. Reading this article has made me re-evaluate the role my own mother played in the development of my life and that of my siblings. This is a tribute to all the great mothers who have sacrificed immensely for the sake of their children. Whoever comes across this article will re-discover their mothers and appreciate their efforts which shaped their lives.

February 22, 2020

শিক্ষা বিষয়ক সাময়িকী শিক্ষালোক
অতীতকে ভিত্তি করে বর্তমানের হাত ধরে ভবিষ্যতে যাত্রার অঙ্গীকার

আশরাফ আহমেদ

'শিক্ষালোক' বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে কর্মরত সিদীপ নামে একটি বেসরকারি সংস্থার শিক্ষা বিষয়ক মুখপত্র। প্রকাশনাটি হাতে নিয়ে প্রচ্ছদের মোহনীয় চিত্রাঙ্কনটি চোখে পড়লে যে কোনো দর্শকই পাতাটি উল্টে পাঠক হয়ে যেতে উৎসাহ বোধ করবেন।

শিক্ষালোকের প্রথম সম্পাদক মোহাম্মদ ইয়াহিয়া। গত বছর ২২ আগস্ট তিনি সবাইকে ছেড়ে না ফেরার দেশে চলে গেলেন। এর সেপ্টেম্বর ২০২০ সংখ্যাটি সমাজকর্মে ও মানব-উন্নয়নে একনিষ্ঠ বহুজনের অতি প্রিয় এই মহান মানুষটির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলিরূপে নিবেদিত।

২০১৪ সালে মাসিক পত্র হিসেবে বছর দুয়েক চলার পর থেকে এটি প্রতি তিন মাসে প্রকাশিত হচ্ছে। করোনা-দুর্যোগের জন্য এবারই কেবল কিছু দেরি করে সংখ্যা বের হচ্ছে। একটি সংখ্যাতেও গাফিলতি না করে এটি ইতিমধ্যে প্রকাশনার গৌরবময় সাত বছর পূরণ করেছে। ৮ম বর্ষ চলছে। বেশ ক'জন প্রথিতযশা প্রবন্ধকার, কবি, লেখক, বিজ্ঞানী, শিল্পী ও সমাজ-সংস্কারকের লেখাসমৃদ্ধ 'শিক্ষালোক' প্রথম থেকেই সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। শিক্ষালোকে কয়েকজন নিয়মিত লিখে থাকেন যাদের মধ্যে আমিও আছি। প্রতিটি সংখ্যায় আমার একটি করে লেখা ছাপা হওয়ার কারণে সাময়িকীটির সঙ্গে আমার একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে।

এনজিওর মুখপত্র শোনামাত্রই কোন প্রকাশনা সম্পর্কে বড়বড় সংখ্যায় ভরপুর যে কাঠখোট্টা একটি ধারণার জন্ম হয় শিক্ষালোক তেমন মোটেই নয়। তা হলে শিক্ষালোক কী ধরণের প্রকাশনা? এ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রতিটি সংখ্যা পর্যালোচনা করে এর চরিত্র সম্পর্কে আমি একটি সংজ্ঞা বের করেছি। তা হচ্ছে 'অতীতকে সম্মান করে বর্তমানের হাত ধরে ভবিষ্যতে এগিয়ে যাওয়ার শিক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ একটি প্রকাশনা।'

লক্ষ করেছি যে, শিশুদের বিকাশ ও শিক্ষার উন্নয়নের জন্য চাপিয়ে দেয়া পশ্চিমা অথবা আমাদের শহুরে শিক্ষাবিদদের পরিবর্তে প্রথমদিকে শিক্ষালোকের প্রায় প্রতিটি সংখ্যায় সিদীপের উঠান স্কুলের শিক্ষিকাদের 'শিশুদের পড়ানোর কৌশল: আমার অভিজ্ঞতা' শীর্ষক লেখা ছাপা হচ্ছিল। মনে রাখতে হবে শিরীন আক্তার শীলা, তাহমিনা আক্তার, শাহনাজ আক্তার, আয়েশা আক্তার, মুর্শিদা আক্তার নীলা এবং রেহানা আক্তার নামের লেখকরা বিশ্ববিদ্যালয় পাশ করা উচ্চশিক্ষিত কেউ নন। মাত্র অষ্টম শ্রেণি, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেটধারী, আর খুব বড়জোর কলেজের একটি বিএ ডিগ্রিধারী এই শিক্ষকরা আমার বোন বা আপনার ভাবি। তারা উঠানে-বসা শিক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত শিশুদের স্কুলের হোমওয়ার্ক তৈরিতে সাহায্য করেন। সংসারের কাজ শেষ করে পিছিয়ে পড়া শিশুদের পড়াতে গিয়ে অমূল্য যে অভিজ্ঞতা তারা অর্জন করেছেন তার আলোকেই শিশুদের ভালোমত বেড়ে ওঠার ব্যাপারে নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করছেন। আমার মতে তাদের অভিমতকে গুরুত্ব দিয়েই আমাদের শিশুশিক্ষা নীতি প্রণয়ন করা উচিৎ। এতে সফলতার সম্ভাবনা অধিক।

শিশুর শিক্ষা শুরু হয় জন্মের পর থেকেই, আর মা-ই শিশুর প্রথম শিক্ষক। অথচ চেষ্টা থাকলেও মা যে সবসময় তার সেই দায়িত্ব পালন করতে পারেন না তা বিষদভাবে তুলে ধরেছেন আলমগীর খান তার 'ঘরে শিক্ষক হিসেবে মায়ের ভূমিকার অন্তরায়' প্রবন্ধে (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৬)। আর যে মা সেই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের সুযোগ পান তিনি শুধু আদর্শ মা-ই নন, তিনি পরিবারে তো বটেই সমাজ তথা দেশের ওপর এক সুদূর প্রসারী প্রভাব রেখে যান। পরবর্তী প্রজন্মের ভেতর দিয়ে সেই প্রভাব কালের গণ্ডি পেরিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

লেখক ফজলুল বারি তার 'আমার মা এবং অন্য সবার মা' নিবন্ধে (এপ্রিল-জুন ২০১৮) ঠিক এই কথাটিই বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। একটি পরিবারের তিন প্রজন্মের মায়েদের অবদানের কথা উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন, 'তাদের মেধা, বুদ্ধি, বিচক্ষণতা একেকটি পরিবারের সদস্যদের কিভাবে সমৃদ্ধ করে তুলেছে তা বাইরের মানুষের কাছে অজানা।' আবার 'এ দায়িত্ব পালনে যে মায়েরা যত বেশি পারদর্শী ছিলেন তাঁদের সংসারই তত বেশি উঠে এসেছে।' লিখেছেন, 'আরও বৃহত্তর পরিসরে যখন দেখি এখনকার প্রজন্মের অগণিত মা, বিশেষ করে নারী শ্রমিক, এমন কি কাজের বুয়া পর্যন্ত তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য সচেতন হয়ে উঠেছে, তখন বিশ্বাস হয় দেশ হিসাবে আমরা এগিয়ে যাব।'

শিশুজীবনে লিঙ্গবৈষম্য নিয়ে রুমানা সুলতানার আলোচনাটি একটি চিন্তা-জাগানিয়া ও সুলিখিত রচনা (এপ্রিল-জুন ২০১৭)। শিশুকালে ঘরের কাজ ভাগ করে দেয়ার মাঝেই লিঙ্গবৈষম্যের ধারণাটি শিশুদের মাথায় বদ্ধমূল করে দেয়া হয়। পরবর্তীতে সামাজিকভাবেও তা গুরুত্ব পায়। কাজের ক্ষেত্রে এই লিঙ্গ বৈষম্যের প্রধান ভুক্তভোগী নারী। পরবর্তী এক সংখ্যায় লেখক

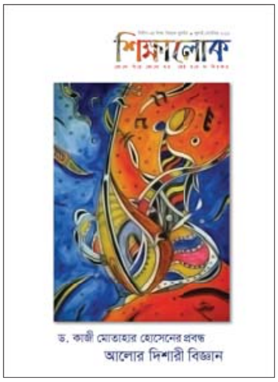

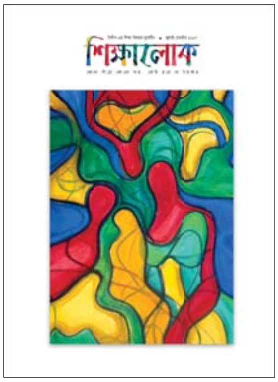

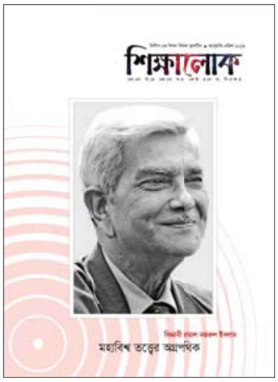

এর প্রতিকারের কথাও সহজভাবেই বাতলে দিয়েছেন (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৭)। পাঠককে কষ্ট করে সমস্যা ও সমাধানটি বুঝতে হয় না। এই নিবন্ধগুলোর সমান্তরালে বেগম রোকেয়া সম্পর্কে খোন্দকার মাহবুবার 'রোকেয়ার স্বপ্ন : নারী-পুরুষ সাম্য' লেখাটি (জানুয়ারি ২০১৫) উল্লেখযোগ্য।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি-বিষয়ক কয়েকটি লেখা, বিশেষ করে কিশোর-কিশোরীর (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৬ সংখ্যায়) এবং প্রসূতি মায়ের (এপ্রিল-জুন ২০১৭ সংখ্যায়) পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ফাহমিদা করিমের নিবন্ধগুলি খুবই প্রয়োজনীয়। কেবল তাই নয়, শিক্ষালোক যে শুধু সমস্যার দিকে অঙ্গুলি প্রদর্শন করেই বসে থাকে না, সমাধানেরও পথ খোঁজে, এসব লেখা তারও প্রকৃষ্ট উদাহরণ। 'গ্রামীণ অর্থনীতিতে নারী' সিংহভাগ অবদান রাখলেও উপযুক্ত স্বীকৃতি পাচ্ছে না বলে বারংবার উল্লেখ করেছেন আবু খালেদ (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৮ সংখ্যায়)। অন্যদিকে একই সংখ্যায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে 'শিক্ষায় মেয়েরা এগিয়ে আর ছেলেরা পিছিয়ে পড়ছে কেন' নিবন্ধে আলমগীর খান নতুন একটি সম্ভাব্য সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

অলোক আচার্যের 'সার্টিফিকেট নয়, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য মানুষ হওয়া' (এপ্রিল-জুন ২০১৭), 'সংস্কৃতি হারিয়ে যান্ত্রিকতায় পিষ্ট হচ্ছে শৈশব' (জানু-মার্চ ২০১৭), 'একগুঁয়ে আভিভাবক বনাম অসহায় শিক্ষার্থী' (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৭), 'প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি ও প্রতিবন্ধকতা' (এপ্রিল-জুন ২০১৮), 'শিশুর মনোজগৎ এবং শিক্ষালাভের আনন্দ' (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৮) প্রবন্ধগুলোর শিরোনাম থেকেই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতাগুলো সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। এর সাথে যোগ হয়েছে আলমগীর খানের 'শিক্ষা, সাক্ষরতা ও সনদপত্র' (জুলাই-আগস্ট ২০১৫), 'শিক্ষা কোনো অবস্থায় বন্ধ থাকতে পারে না' (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৬) এবং শিশির মল্লিকের 'শিশুর পূর্ণাঙ্গ বেড়ে ওঠা' (এপ্রিল-জুন ২০১৭)। শিশুকে শিশুর মত গড়ে না উঠতে দিয়ে, উন্মুক্ত ও প্রাকৃতিক পরিবেশে বাড়তে না দিয়ে, খেলাধুলার ব্যবস্থা না করে তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে পরীক্ষায় ভালো ফল করার দাবি। তাতে শিশুদের একদিকে যেমন মানসিক বিকাশের পথ সীমিত হয়ে পড়ছে, অন্যদিকে শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জনের জন্য না হয়ে সার্টিফিকেট ও চাকরি অর্জনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

আমার ছোটকালে প্রাথমিক শ্রেণির ক্লাশগুলোতে প্রতিদিন এক ঘণ্টার শরীরচর্চা ও খেলাধুলা, হাতেকলমে কাঠের ও মাটির কাজ, এবং ছবি আঁকায় উৎসাহ ও শিক্ষা দেয়া হতো। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃত্যগীত ও বিভিন্ন খেলাধুলার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হতো। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের যুবসমাজের মাঝে অস্থিরতা, মাদকাসক্তি এবং আত্মঘাতী কাজের সাথে নানা অনৈতিক ও অসামাজিক কাজের প্রাদুর্ভাব লক্ষ করা যায়। উপরোক্ত প্রবন্ধগুলোর মতোই সমাজবিজ্ঞনীরা এর কারণ হিসেবে শিশু থেকে উচ্চতর শ্রেণি পর্যন্ত নৈতিক শিক্ষা, শরীরচর্চা, খেলাধুলা, এবং চারু ও কারুকলার মত বিনোদনমূলক কার্যক্রমের অভাব বলে চিহ্নিত করেছেন। আলমগীর খানের 'শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার মেলবন্ধন' নিয়ে দুটো (জানুয়ারি ২০১৫ এবং জানুয়ারি-মার্চ ২০১৭) এবং শিশির মল্লিকের 'বিষয়ভিত্তিক ও চারুকারু শিক্ষার সমন্বয় জরুরি কেন' (জানুয়ারি-মার্চ ২০১৮) তেমনই তিনটি প্রবন্ধ। তাদের যথাক্রমে লেখা 'চিত্রশিল্পী সফিউদ্দিন আহমেদ-এর স্মরণে স্বপ্ন ও সৌন্দর্যের ছবিমালা' (নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৫) এবং 'জীবনের গানই চিত্রশিল্পী উত্তমের (উত্তম তালুকদার) গান' (এপ্রিল-জুন২০১৮) নিবন্ধ দুটো এবং আরো কিছু লেখা চারুশিল্পের প্রতি তাদের গভীর আগ্রহেরও পরিচয় দেয়। আলাউল হোসেনের 'ভাস্কর্যে বঙ্গবন্ধু ও বাঙালির ইতিহাস' (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৬) তেমনই আরেকটি লেখা।

শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা কখনোই একটি জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। এর সাথে প্রয়োজন হয় ব্যবহারিক ও নৈতিক শিক্ষা। আর এসব শিক্ষা শুধু কাঠখোট্টা মুখস্থবিদ্যার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকলে চলে না। শিশুদের সুস্থ মানসিক বিকাশের জন্য প্রয়োজন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার শিক্ষা, বয়স্ক লোকদের সম্মান প্রদর্শন, এবং খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের চর্চা। এ সবই সিদীপ প্রবর্তিত শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ। শিক্ষালোকে বিভিন্ন আনন্দদায়ক কাজে নিমগ্ন রঙিন সাজে হাসিমুখো

> একদিকে 'শিক্ষালোক' অতীতের বরেণ্য কবি-সাহিত্যিক-চিন্তাবিদদের কাজকে যেমন সামনে তুলে ধরছে, অন্যদিকে সিদীপ তার প্রতিটি উঠান স্কুলের বার্ষিক সাংস্কৃতিক উৎসবে গ্রামের সর্বজ্যেষ্ঠ নারী ও পুরুষকে জনসমক্ষে সম্মান প্রদর্শন করার একটি রীতি চালু করেছে

শিশুদের এইসব খবরাখবর দেখলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়।

ঠিক শিশুশিক্ষা বা প্রচলিত শিক্ষা-সম্পর্কিত না হলেও 'শিক্ষালোক' আরো অনেক বিষয়ে আলোকপাত করে থাকে। সেগুলো একদিকে যেমন দেশের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয়, অপর দিকে আমাদের অনেকেরই অজানা আর সুখপাঠ্য। তেমন একটি লেখা হচ্ছে ফজলুল বারির 'সুকুমার দাস ও উন্নয়ন ভাবনা' (এপ্রিল-জুন ২০১৭ সংখ্যায়)। একটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সুকুমার দাসের পরিবার বাঁশবেতের টুকরি বানিয়ে চরম দারিদ্র্যের মাঝে জীবনধারণ করে। সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে নিয়োজিত সারা দেশে এতো উন্নয়ন সংস্থার ছড়াছড়ি, কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের প্রায় অর্ধশতাব্দী পার হতে চললেও ভূমিহীন এই শিল্পীগোষ্ঠীর দিকে তাকানোর কারো ফুরসত হয় নাই। তাই বাংলাদেশের অবহেলিত ও প্রান্তিক শ্রমজীবী একটি গোষ্ঠীকে নিয়ে আবেগ বিবর্জিত কিন্তু কর্তব্যনিষ্ঠ এ লেখাটি পড়ে শ্রদ্ধায় লেখকের প্রতি মাথা নুয়ে আসে।

বাংলাদেশ শুধু নদীমাতৃক একটি দেশই নয়, বছরের অনেকটা সময় দেশটির অধিকাংশ স্থান পানির নিচেই থাকে। অথচ আমরা পানির হাহাকার মুক্ত নই। লেখক-গবেষক আইয়ুব হোসেন 'নিরাপদ পানির বিকল্প' (আগস্ট ২০১৪), 'বাংলাদেশের পানি সম্পদ' (নভেম্বর ২০১৪), এবং 'বাংলাদেশের পানিসম্পদ' (জুলাই-আগস্ট ২০১৫) শিরোনামের তিনটি প্রবন্ধে পানিকে আমাদের সম্পদ বলেছেন, এবং এ সংক্রান্ত সমস্যা ও প্রতিকারের উপায় নিয়ে আলোচনা করেছেন। বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ শহিদুল ইসলামের জলবায়ু বিষয়ক 'ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বাঁচাতে হবে' (এপ্রিল-জুন ২০১৭) নিবন্ধটি একটি সময়োপযোগী, তথ্যবহুল ও গুরুত্বপূর্ণ লেখা। বর্তমান পৃথিবীর কিছু অঞ্চল, বিশেষ করে বাংলাদেশ, মানুষের কৃতকর্মের ফলে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের অভিশাপে জর্জরিত। বিভিন্ন সমীক্ষা অনুযায়ী আগামী পঞ্চাশ বছরে দেশটির কুড়ি শতাংশ স্থলভাগ সমুদ্রে বিলীন হয়ে যাবে। সেই পরিস্থিতিতে বিশ্বের তাপমাত্রা রোধে ধনী দেশ যুক্তরাষ্ট্রের দায়িত্বহীনতার সাথে সাথে আমাদের নিজেদের প্রচেষ্টার অপ্রতুলতার কথা আলোচনা করা হয়েছে।

মনজুর শামসের 'গ্রামের দুই সফল ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার কথা'য় (এপ্রিল-জুন ২০১৭) রুমার ঘরের কারখানার বিবরণটি পড়ে ভালো লেগেছে। আধুনিক কালে আমেরিকায় যেসব ফরমায়েশে বাড়ি বানানো হয় তা রুমার কারখানার কনসেপ্টেই চলে। জমি, মূলধন, এবং মালিকের পছন্দানুযায়ী এক বা একাধিক কন্ট্রাক্টর বাড়িটি বানিয়ে দেয়। সারি সারি তুলে রাখা বিক্রির জন্য বাড়ির দৃশ্যটি আমেরিকার 'মোবাইল হোম'-এর সমকক্ষ ভাবা যেতে পারে। কিন্তু মুন্সীগঞ্জের গ্রামে এই বাড়ির কারখানার বিশেষত্ব হলো কোনো স্থপতি বা প্রকৌশলী না হয়েও পাড়াগাঁয়ের মেয়ে রুমা নিজ গ্রামেই এই কারখানা দিয়ে বসেছেন, এবং উত্তরোত্তর তার ব্যবসা ও জীবন ধারণের মান উন্নত করে চলেছেন। আরেক সফল উদ্যোক্তা রাজু। স্বামী-পরিত্যক্ত দরিদ্র মায়ের সন্তান। পেন্সিলে লেখা কাগজ রবার দিয়ে মুছে তার ওপর আবার লিখতেন। তাই প্রতিজ্ঞা করলেন, বড় হয়ে খাতা কলমের দোকান দেবেন। অনার্স ও মাস্টার্স শেষ করে এখন প্রতিদিন এক ট্রলি খাতা সরবরাহ করেন পুরো পাবনা জেলায়। ব্যবসায়ে উন্নতি হওয়ায় চারতলা বসতবাড়ি নির্মাণে হাত দিয়েছেন। শিক্ষালোকের বিভিন্ন সংখ্যায় এমনিভাবে অনেক প্রান্তিক লোকের জীবন সংগ্রাম এবং অভিনব পদ্ধতিতে দারিদ্র্যমুক্তির ছোট ছোট কিন্তু আশা জাগানিয়া খবরাখবর আমাদের উদ্দীপিত করে। এছাড়াও ভিক্ষুক পুনর্বাসন নিয়ে দেখতে পাই সেখ সেলিমের একটি ভাল লেখা (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৬ সংখ্যায়)।

বাংলাদেশে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার আলোচনা সমালোচনা করতে গিয়ে 'শিক্ষালোক' অতীতের দিকেও ফিরে তাকিয়েছে বারবার। সাময়িকীটি অনেক ক্ষেত্রেই দেখিয়েছে যে সমস্যাটি আজকের নতুন কিছু নয়। তখনকার শিক্ষা ব্যবস্থাকে ব্যঙ্গ করে রবীন্দ্রনাথ 'তোতা কাহিনি' নামে যে ছোট গল্পটি লিখেছিলেন, পত্রিকাটি পুনরায় তা ছাপিয়েছে (এপ্রিল ২০১৫)। গল্পে রাজার নির্দেশে মূর্খ পাখিকে কথা শেখাতে গিয়ে পণ্ডিতরা পাখির ঠোঁটে পুঁথির কাগজ ঠেলে ঢুকিয়ে দিল। এভাবে কখন যে পাখিটিকে মেরে ফেলা হয়েছিল তা কেউ বুঝতে পারলো না। শিক্ষিত সেই পাখিটিকে 'রাজা টিপিলেন, সে হাঁ করিল না, হুঁ করিল না। কেবল তার পেটের মধ্যে পুঁথির শুকনো পাতা খসখস গজগজ করিতে লাগিল।' শিক্ষালোকের প্রথম সংখ্যায় তাঁর লেখা 'শিক্ষার হেরফের'ও আমাদের অনেক কিছু শেখায়। শিক্ষার সাথে সংস্কৃতির সম্পর্কটি যে আজকের নতুন কিছু নয় তার প্রমাণস্বরূপ প্রায় ৮০ বছর আগে রচিত রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষা ও সংস্কৃতি' প্রবন্ধটি শিক্ষালোক আবার ছেপেছে (জানুয়ারি-মার্চ ২০১৭ সংখ্যা)। তাঁর 'আবরণ' প্রবন্ধে (মে-জুন ২০১৬) রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'বই পড়ার আবরণে মন শিশু কাল হইতে আপাদমস্তক আবৃত হওয়াতে আমরা মানুষের সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশা করিবার শক্তি হারাইতেছি।' আরো লিখেছেন, একমাত্র 'এই বইপড়াটাই যে শেখা, ছেলেদের মনে এই অন্ধ সংস্কার যেন জন্মিতে দেয়া না হয়।'

এভাবে 'অত্যাচারিতের শিক্ষা'র ওপর আহমদ ছফার আলোচনা (আগস্ট ২০১৪ সংখ্যায়) এবং স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে কোরানের প্রথম বাংলা অনুবাদক ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের (মে-জুন ২০১৫) নিবন্ধটিও আজকের সমস্যার অতীত রূপের কথা আমাদের জানতে সাহায্য করে।

প্রথমে বৃটিশ এবং পরে পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় কেরানি সৃষ্টির জন্য ইংরেজি শিক্ষার যে জোয়াল আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল, আমরা এখনো তা বহন করে চলেছি। ফলে আধুনিক বিশ্বে উন্নতির সোপান বিজ্ঞান শিক্ষা ও চর্চার দিক থেকে আমাদের যুবসমাজ এখনো মুখ ফিরিয়ে রেখেছে। আজকের প্রতিযোগী বিশ্বে ইংরেজি পরিহার করার যেমন উপায় নেই, তেমনি পুরো জাতিকে মাতৃভাষার বদলে ইংরেজিতে শিক্ষাদান করা যে একটি অদূরদর্শী কাজ তাও সমপরিমাণে সত্য। বিজ্ঞান শিক্ষাকে জনপ্রিয় করে তোলার মানসে শিক্ষালোক বেশ ক'টি পুরনো প্রবন্ধ ছেপেছে। মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর ছাত্র বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু বলেছিলেন, 'যারা বাংলায় বিজ্ঞান চর্চা করা সম্ভব নয় বলে মনে করেন, তারা হয় বিজ্ঞান বোঝেন না অথবা বাংলা জানেন না।' সহজ ভাষায় শব্দ, আলো, বিদ্যুৎ ও বেতার তরঙ্গের মত জটিল বিষয় নিয়ে জগদীশচন্দ্র বসুর 'অদৃশ্য আলোক' (নভেম্বর ২০১৪) প্রবন্ধটি পড়লে বোঝা যায় আজ থেকে প্রায় একশত বছর আগেই মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চা করা তেমন দুরূহ ব্যাপার ছিল না। তার লেখা 'বিজ্ঞানে সাহিত্য' (জুলাই ২০১৪ সংখ্যা) প্রবন্ধটির মতোই কাজী মোতাহার হোসেন 'আলোর দিশারী বিজ্ঞান' (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৬) প্রবন্ধে লিখেছেন 'বিজ্ঞান ও সাহিত্য একই সত্যের দুটি ভিন্ন রূপ।' ছোটদের জন্য ছড়াকার সুকুমার রায় সহজ ভাষায় 'সূর্যের কথা' (জুলাই-আগস্ট ২০১৫ সংখ্যা) লিখে একইভাবে দেখিয়েছেন যে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা করাটা একেবারেই কঠিন কাজ নয়। যা প্রয়োজন তা হচ্ছে সদিচ্ছা।

এ ছাড়া শিক্ষালোক সমাজ সংস্কারক আখতার হামিদ খানের জীবন ও চিন্তা নিয়ে লেখা ছেপেছে (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১৫ সংখ্যা)। তরুণদের উদ্দেশে প্রদত্ত কবি নজরুলের ভাষণ (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৭ সংখ্যা) এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রম্যরচনা 'তৈল' (এপ্রিল-জুন ২০১৮) পুনর্মুদ্রণ করে 'শিক্ষালোক' আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে সামনে তুলে ধরেছে।

বাংলা সাহিত্যের এসব যশস্বী লেখকের কালোত্তীর্ণ লেখার পাশাপাশি সাহিত্য বিষয়ক অনেক লেখা 'শিক্ষালোক' প্রকাশ করে আসছে নিয়মিত। সালেহা বেগমের 'রবীন্দ্রনাথ : গ্রাম উন্নয়নের চিন্তায় ও কর্মধারায়' (অক্টোবর ২০১৪) এবং 'শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য চর্চা' (এপ্রিল ২০১৫) প্রবন্ধগুলো ব্যক্তি ও সমাজ সচেতন রবীন্দ্রনাথকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। বিদ্রোহী কবি নজরুলের ওপর তিনটি সাহিত্য আলোচনা (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৮) এবং ড. আশরাফ পিন্টুর পল্লীর নির্জনতা-প্রেমী কবি 'ওমর আলীর প্রাতিস্বিকতা' (অক্টোবর ২০১৪), 'ওমর আলীর কাব্যে ইতিহাস চেতনা' (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৬), 'ওমর আলীর কবিতায় লোকজ উপাদান' (নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৫), 'সুকান্তের চেতনায় প্রতিবাদী ভাবনা' (এপ্রিল-জুন ২০১৮) ইত্যাদি প্রবন্ধ আধুনিক ও পূর্ববর্তী বাঙালি কবিদের মনোজগতের কিছুটা সন্ধান দেয়।

এ ছাড়াও শিক্ষালোক প্রতিটি সংখ্যায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ, গল্প, পুস্তক সমালোচনা, স্মৃতিচারণ, কবিতা ও ভ্রমণকাহিনি ছাপিয়ে যাচ্ছে। সবচেয়ে লক্ষণীয় ব্যপার হলো গল্প কবিতার কথা ছেড়ে দিলেও প্রতিটি প্রবন্ধে কোথাও দাঁতভাঙ্গা শব্দ ও ঘোরালো বাক্যের আবর্তে মূল কথাটি হারিয়ে যায়নি। উঠান স্কুলের কোনো অজ্ঞাত শিশুছাত্রের অথবা প্রতিষ্ঠিত কোনো চিত্রকরের আঁকা সব প্রচ্ছদ নিয়ে শিল্প-সংবাদ ও আলোচনা-সমৃদ্ধ শিক্ষালোকের প্রতিটি সংখ্যা খুব সহজেই দর্শক-পাঠকের মন কেড়ে নেয়। ফলে পাঠক এটিকে একটি শিল্প ও সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা বলেও মনে করতে পারেন। তাতে তার কোনো ভুল হবে না। কারণ শিল্প ও সাহিত্য জীবন-বহির্ভূত কোনো বিষয় নয়। জীবনের 'যাহা কিছু সুন্দর, তাহাই শিল্প'। উন্নত ভবিষ্যৎ নির্মাণে 'শিক্ষালোক' শিল্পসম্মতভাবে আমাদেরকে সহায়তা করছে। আর সেই প্রসাদগুণে সাহিত্য প্রেমিকরা আত্মার খোরাক পাচ্ছেন।

সাহিত্য বলুন আর জীবনের সমস্যা বলুন, বর্তমানের সাথে অতীতের মেলবন্ধনের এই অসামান্য প্রয়াস আমি অসীম কৃতজ্ঞতার সাথে লক্ষ করছি। লেখাগুলো পড়ে একটি বিষয় খুব পরিষ্কার যে আজ যেগুলোকে বর্তমান প্রজন্মের সমস্যা বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে তার সবকিছুই নতুন নয়। অতীতেও সেগুলোর অনেক বিদ্যমান ছিল, এবং ক্ষেত্রবিশেষে পূর্বতন মনীষীরা সমাধানের কথাও বলে গেছেন। এভাবে তাঁদের পুরনো ধ্যান-ধারণা নতুন করে ছেপে 'শিক্ষালোক' অতীতের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতার কথাই যেন স্মরণ করিয়ে দিল। পৃথিবীতে কোনো সভ্যতাই হঠাৎ করে গজিয়ে ওঠে না। অতীতের সৃষ্ট একটি ধারণা বা আবিষ্কারের ফলেই নতুন ও উন্নততর ধারণা ও আবিষ্কার দেখতে পাই। উত্তরসূরীদের বহু বছরের লিপিবদ্ধ পর্যবেক্ষণের ফলেই চার্লস ডারইন তাঁর 'বিবর্তনের মতবাদ' দিতে পেরেছিলেন। একই কারণে আলবার্ট আইনস্টাইনও 'আপেক্ষিক তত্ত্ব'তে পৌঁছাতে পেরেছিলেন। অতীতের সিঁড়ি প্রস্তুত না থাকলে তাঁদের কাউকেই আজ আমরা উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে দেখতে পেতাম না।

এভাবে অতীতের সৃষ্ট একটি ধাপের ওপরই নতুন কিছু দাঁড়িয়ে থাকে। নানীর গর্ভে জন্ম হয় মাতার। পিতার ঔরসে জন্মেছি আমি। ছেলে হয় পিতা। অতীতকে অস্বীকার করার কোনো

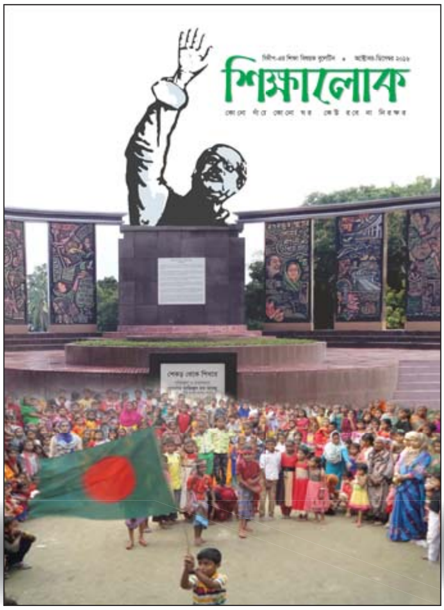

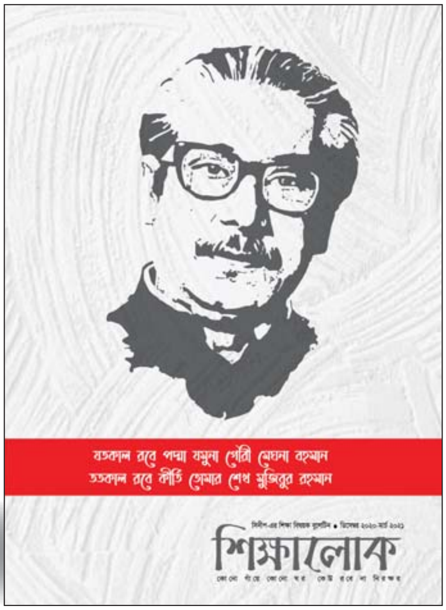

উপায় যেমন নেই, আমার সৃষ্টি ও বেড়ে ওঠাতে মাতাপিতার ও গুরুজনের অবদানও অস্বীকার করার উপায় নেই। অথচ প্রাচীন ভারতীয় ও আরবি-পার্সী সংস্কৃতিতে শিক্ষাগুরু এবং পিতামাতার প্রতি আচরণের যেসব উদাহরণ ছিল আমরা সেসব অনেক আগেই ভুলে বসে আছি। শুধু তাই নয়, শ্রদ্ধা জানানো দূরে থাকুক অনেক সময় আমরা বয়স্ক ও বৃদ্ধদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণও করে থাকি। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান আমাদের মহাশূন্যের শিখরে নিয়ে গেলেও প্রাচ্যের দৃষ্টিতে যা গুরুজনদের উপযুক্ত ও প্রাপ্য সম্মান, তা দেয়ার শিক্ষায় গুরুত্বের অভাব আছে বলে মনে হয়। এর সমাধানে একদিকে 'শিক্ষালোক' অতীতের বরেণ্য কবি-সাহিত্যিক-চিন্তাবিদদের কাজকে যেমন সামনে তুলে ধরছে, অন্যদিকে সিদীপ তার প্রতিটি উঠান স্কুলের বার্ষিক সাংস্কৃতিক উৎসবে গ্রামের সর্বজ্যেষ্ঠ নারী ও পুরুষকে জনসমক্ষে সম্মান প্রদর্শন করার একটি রীতি চালু করেছে। মাহমুদা আক্তার লিখেছেন ময়নামতিতে এক অনুষ্ঠানে শতবর্ষী শ্রদ্ধেয় এক বৃদ্ধাকে তারা সম্মান জানাতে সক্ষম হয়েছিলেন (নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৫)।

ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে 'শিক্ষালোক' এভাবে বহুকাল পর্যন্ত আলোর দিশারি হয়ে আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাক, এই কামনা করি।

শিল্প সাহিত্যের অনলাইন কাগজ 'প্রতিকথা' (১৫ অক্টোবর ২০২০) থেকে এখানে পুনর্মুদ্রিত হলো।

লেখক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক, বর্তমানে একজন বায়োমেডিক্যাল বিজ্ঞানি হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত।

বিজয়

গোলাম কুদ্দুস চঞ্চল

স্বাধীনতা নয়
বদ্ধ পুকুরে টলমল জল
মরা গাছে ধরা
কাঁচা পাকা টসটসে ফল।

ছিনিয়ে আনতে তারে
ভেট দিতে হলো ঢের
ত্রিশ লাখ তরতাজা প্রাণ
সাথে সম্ভ্রম মাবোনের।

বিজয় মানে নয় কেবলই
যুদ্ধ জয়গাথা
বিজয় মানে নতুন করে বাঁচা
বিজয় মানে লাল সবুজের
মুক্ত উড়োউড়ি
ভেঙে দিয়ে অধীনতার খাঁচা।

অভিবাদন তোমাকে একাত্তর
ন'মাসে অর্জিলে স্বাধীনতা
ষোলই ডিসেম্বরের হাত ধরে
শোনালে মুক্তির বারতা।

রক্তের ঋণে বেঁধেছ জাতিকে
দিয়েছ পতাকা সবুজে লাল
হটিয়ে শোষণের কালোরাত
ভেঙে পরাধীনতার বেড়াজাল।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে গৃহহীনদেরকে গৃহ উৎসর্গ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার রতনপুর ইউনিয়নের ১৪টি গ্রামের ৫১টি গৃহহীন পরিবারের মাঝে গৃহ নির্মাণ করে দেয়া হয়। গত বছর ঘরের নির্মাণ কাজ শেষ করা হয় এবং এ বছর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে উৎসর্গ করে উক্ত পরিবারগুলোর মাঝে গৃহগুলো বিতরণ করা হয়। গৃহহীন মানুষেরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উৎসর্গকৃত গৃহগুলো পেয়ে খুবই খুশি।

অনলাইন আন্তর্জাতিক সেমিনারে প্রান্তিক মানুষের জন্য সামাজিক মূলধন বিষয়ক গবেষণা-প্রবন্ধ

CSWPD Foundation ও পিপলস ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের (PUB) যৌথ আয়োজনে সম্প্রতি ৩ থেকে ৬ এপ্রিল ঢাকায় Strengthening Social Solidarity, Community Resilience & Global Connectedness বিষয়ে WSWD2021 শীর্ষক চতুর্থ আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ৯৬ জনসহ মোট ১৫০ জন সমাজকর্মী ও গবেষক অনলাইনে তাদের প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ও বক্তব্য রাখেন। ৪ এপ্রিল সম্মেলনে সিদীপের পক্ষ থেকে সংস্থার ভাইসচেয়ারম্যান শাহজাহান ভুঁইয়া এবং গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা আলমগীর খান Social capital building support by NGOs for empowerment, integration and social development of the poor and excluded শীর্ষক যৌথ গবেষণা-প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেন।

ভাষার লড়াই: বাংলায় জ্ঞানচর্চা